এরদোগানঃ ইসলাম নাকি সেকুলারিজম?

শাইখ ড. তারিক আব্দুল হালিম

অনুবাদঃ মুফতি আনাস আব্দুল্লাহ

আল-ফজর

এরদোগান

ইসলাম নাকি ধর্মনিরপেক্ষতা?

মূল: শাইখ ড. তারিক আবদুল হালিম

অনুবাদ: মুফতি আনাস আব্দুল্লাহ

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামের মধ্যে এরদোগান

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে, তাদের উপর। অত:পর:

আমি জানি, আমার এই গবেষণাটি এমন সময় সামনে এসেছে, যখন মানুষের মাঝে বিচিত্রসব ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে আছে। কেউ ঈমান-কুফরের সাথে সম্পর্কিত ফিকহের বিধি-বিধানের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে। আর কেউ কেউ শরীয়তের লাগাম থেকে মুক্ত হয়ে নিজ প্রয়োজন ও প্রবৃত্তি অনুসারে বিচার করে। আবার পরাজিত মানষিকতা ও হীনমন্যতা অনেককে সুনির্দিষ্ট বিশেষ কোন মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য ও প্ররোচিত করে। যেমন ডুবন্ত মানুষ ভেসে যাওয়া খড়কুটো আকড়ে ধরে।

আমি এটাও জানি যে, অনেকের উপরই এ প্রবন্ধটি প্রভাব ফেলবে। কেউ আদবের সাথে জবাব দেবে আর কেউ গালিগালাজ ও বিদ্রুপ করবে। এটা প্রত্যেকের মৌলিক প্রকৃতি, বেড়ে উঠা, ইলম ও কোন জামাআতের সাথে তার সম্পৃক্ততা রয়েছে, তার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমি এর এমন ইলমী জবাব ও খণ্ডন দেখার আশা করি যা পয়েন্ট টু পয়েন্ট দলিলের ভিত্তিতে হবে। যেমনটা আমি কোন কোন গবেষকের লেখাতে শরীয়ত বিরোধী কিছু দেখতে পেলে তার জবাব লেখার ক্ষেত্রে করে থাকি।

যে সকল বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে সকল মানুষকে এবং বিশেষভাবে মুজাহিদগণকে ভাবিয়ে তুলেছে, তার মধ্যে অন্যতম হল রজব তাইয়েব এরদোগান। কেউ তার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাকে যুগের বাদশা ও যামানার খলিফা বানিয়ে ফেলেছে। তার মাঝে দেখতে পেয়েছে মুসলমানদের শক্তি ও সম্মান। কেউ মাঝামাঝি আছে, তারা বলে: সে মুসলিম, তাই তার সাহায্য-সহযোগীতা করা যায়। অপরদিকে কেউ বলে: সে কাফের, মুসলিম

নয়। কাট্টা ধর্মনিরপেক্ষ। এরদোগান ধর্মনিরপেক্ষতার আলোকে শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে সম্মান করে। তাই তার সাথে মুসলমানের অনুরূপ মুআমালা করা জায়েজ নেই।

আসলে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে কুফরীর কথা বলা আমার নিজের কাছে একটি অপছন্দনীয় বিষয়। কিন্তু যখন এমন কোন বাস্তব কারণ পাওয়া যায়, যা এই সিদ্ধান্ত অনুসন্ধান ও প্রকাশ করা আবশ্যিক করে তুলে, তখন আর উপায় থাকে না। তাকফির কোন শখের বিষয় নয়, যা দ্বারা কেউ তৃপ্তি মিটাবে। বরং এটা হল কেউ আল্লাহর রহমত থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং তার স্থায়ী আযাবে নিপতিত হওয়ার ব্যাপারে ফায়সালা। যে এর হাকিকত বুঝে, তার নিকট এটা সবচেয়ে ভয়ংকর ও কঠিন বিষয়।

রজব তাইয়্যেপ এরদোগান একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। যিনি তুরস্ক ও সমগ্র অঞ্চলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছেন। তার নিজ দেশের ইতিহাসে তিনি মর্যাদার উচ্চস্তরে পৌঁছেছেন। কারণ বিগত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তার রাজধানী ছিল খেলাফতের রাজধানী। উনিশ শতক পর্যন্ত তার দেশ পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল। এছাড়া তার দেশের ভৌগলিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কারণে আঞ্চলিক ভূমিকাও তাকে একটি সক্রিয় গুরুত্ব দান করেছে।

যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলছি, তা অত্যন্ত জটিল বিষয়। কেউ এ বিষয়ে ফাতওয়া দিতে চাইলে তার উপর অবশ্য কর্তব্য হল, এর শাখাগত মাসআলাগুলো অনুসন্ধান করা, তার সূত্র ও দলিলগুলো যাচাই করা এবং তার ভিত্তিতে সঠিক হুকুম প্রয়োগ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-সামর্থ্য ব্যায় করা। শুধু সাধারণভাবে বর্ণিত হুকুমগুলো আরোপ করে দেয়াই যথেষ্ট নয়। চাই তাকফীরের বিষয়ে হোক অথবা অন্য কোন বিষয়ে হোক।

এখানে ফায়সালার মূল পয়েন্ট হল:

ইসলাম ধর্মে কি এমনটা আদৌ জায়েয আছে যে, আল্লাহ ও তার রাসূলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় এবং ইসলামের কিছু কিছু নিদর্শন ও বিধি-বিধানও বাস্তবায়ন করে, এমন ব্যক্তিকে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে?

যদি জায়েয হয়, তাহলে প্রশ্ন হল:

যে সকল শাসক বা বিচারক মুখে ইসলামের কথা বলে এবং ইসলামের কিছু নিদর্শন ও বিধান বাস্তবায়ন করে, তারা কাফের হবে কিসের ভিত্তিতে?

এটাই হল মূল পয়েন্ট। আপনারা বুঝতেই পারছেন যে, বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। যেহেতু এর শাখা-প্রশাখাগুলো ইলমে তাওহিদ ও আকায়েদের অংশ। আবার 'দার' এর বিধি-বিধান ও রিদ্দার মাসায়েলের বিবেচনায় ইলমে ফিকহেরও অংশ।

যাতে এ মাসআলার গ্রন্থিগুলো পার্টে পার্টে খুলতে পারি এবং তার যথার্থ বিশ্লেষণ করতে পারি, তার জন্য আমরা এ মাসআলায় শুধু ইলম ও ইনসাফের ভিত্তিতে আগাবো। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে আমরা আলোচনা করবো:

১. ইসলাম ধর্মে কি এটা আদৌ জায়েয আছে যে, একজন ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় এবং ইসলামের কিছু কিছু প্রতীক ও বিধান পালন করে, এমতাবস্থায় তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে?

২. সর্বসম্মত ও দ্ব্যর্থহীন কুফরী কাজে লিপ্ত হওয়া অবস্থায়ও কি কারো প্রকৃত ইসলাম বাকি থাকতে পারে?

৩. ইসলাম ও কুফরের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মানুষ আর শাসক বা বিচারক শ্রেণীর মাঝে পার্থক্য এবং ফাসেক শাসক ও কাফের শাসকের মাঝে পার্থক্য।

৪. ইসলাম ও কুফরের সাথে সংশ্লিষ্ট শরীয়তের বিধানাবলীতে কোন একজন ব্যক্তির উপর বিধান আরোপ করা, আর একটি জামাতের উপর বিধান আরোপ করার মাঝে পার্থক্য।

৫. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের (secularist) দ্বারা শাসিত দেশের হুকুম।

৬. ‘ইকরাহ’ বা বলপ্রয়োগ কখন সাব্যস্ত হবে? ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর বিধান কী এবং জামাতের ক্ষেত্রে তার বিধান কী?

৭. এরদোগান সম্পর্কে মতামত কী?

উপরোক্ত বিষয়গুলো প্রসঙ্গে আল্লাহর উপর ভরসা করে আমরা বলবো:

১. ইসলাম ধর্মে কি এটা আদৌ জায়েয আছে যে, একজন ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় এবং ইসলামের কিছু কিছু প্রতিক ও বিধান পালন করে, এমতাবস্থায় তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে?

উত্তর স্পষ্ট। হ্যা, জায়েয আছে। এমন ব্যক্তিকে কাফের আখ্যায়িত করা যেতে পারে। বরং এটা দ্বীনের অতি সাধারণ জ্ঞাতব্য একটি বিষয়। কারণ আল্লাহ তা’আলা জন্মগত কুফরী আর রিদ্দা বা ধর্মত্যাগের কুফরীর মাঝে পার্থক্য করেছেন। জন্মগত কাফির হল, যে অমুসলিম পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। চাই আহলে কিতাব হোক বা অন্য ধর্মাবলম্বী হোক। আর মুরতাদ হল যে, মুসলিম হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছে অথবা জন্মের পর সেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারপর ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

“তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যায়”।

তাহলে আল্লাহ তা’আলা এমন একশ্রেণীর মানুষ থাকার কথা জানালেন (যারা মুসলিম হবার পর কাফিরে পরিণত হয়)। এটা স্পষ্ট। কোন সংশয় নেই। কিন্তু আমাদের আলোচনা হল এমন এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যার বাহ্যিক অবস্থা ইসলাম ও কুফরের মাঝে সংমিশ্রিত হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের

আলোচনা করতে হবে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি, দল বা গ্রুপের উপর কুফরের হুকুম আরোপ করার মাসআলা নিয়ে। প্রথমে আমরা ব্যক্তির বিষয়টি দেখবো, কেননা এটাই হল মৌলিক একক, যার উপর অন্য সব বিষয় ভিত্তি করে।

আমরা জানি যে, তাওহিদ হল:

১. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে জানা, তার জন্য উপযুক্ত সিফাতগুলো সাব্যস্ত করা এবং তার থেকে অনুপযুক্ত বিষয়গুলো নাকচ করা। যেমন শরীক বা উপমা সাব্যস্ত করা। সন্তান বা পিতা সাব্যস্ত করা কিংবা জিন বা ফেরেশতাদের সাথে বংশীয় সম্বন্ধ করা।

২. যা জানলাম, তা তাসদীক করা, অর্থাৎ সত্য বলে বিশ্বাস করা।

তাসদীক এর ক্ষেত্রে তিন ধরণের মতামত রয়েছে:

(ক) তাওহিদ বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য তাসদীক আবশ্যক নয়। যেমনটা কাররামিয়া সম্প্রদায় বলে থাকে। এই শ্রেণীটি ধর্ম থেকে বের হয়ে গেছে।

(খ)কেউ তাসদীক বলতে বোঝায় শুধু সংবাদ বা সংবাদদাতাকে সত্যবাদী বলা। অর্থাৎ আমরা যা জানলাম, তা সত্য, সঠিক ও নিশ্চিত। কিন্তু এতটুকুর পরে এটা আর কিছু আবশ্যক করে না। এরা হল সীমালঙ্ঘনকারী মুরজিআ (গুলাত আল-মুরজিআ) শ্রেণী। এ মতের কারণে তারা মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত নয়। কারণ অনেক খৃষ্টান ধর্মীয় গুরুও তাসদীক করেছে, কিন্তু তা তাদেরকে কুফর থেকে মুক্তি দেয়নি।

(গ) কেউ বলে, এই তাসদীক দ্বারা তাওহিদ সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত হল: এটা সামগ্রীকভাবে আমলকেও আবশ্যিক করতে হবে। এরা হল সাধারণভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ।

অত:পর আহলুস সুন্নাহ আবার দুই দলে বিভক্ত। প্রথম দলটি হানাফিদের। তারা বলে এ তাসদীকটিই সত্তাগতভাবে বিশেষ এক ধরণের তাসদীক।

মুরজিআরা যেমনটা বলে, তেমন নয়। সুতরাং এ তাসদিকের ভেতরেই, আবশ্যকীয় শর্তরূপে আমল ঈমানের পূর্বশর্ত হওয়ার স্বীকারোক্তিও আছে।

দ্বিতীয় দল হল: সাধারণ আহলুস সুন্নাহর। তাদের মত হল মারিফা (তথা শুধু জানা) ও তাসদীকের পরও ঈমানের তৃতীয়, আবশ্যকীয় আরেকটি অংশ রয়েছে। তা হল নিজের ওপর আমল ও অনুশাসনগুলো আবশ্যিক করে নেয়া। অর্থাৎ স্বীকারোক্তি দেয়া, আনুগত্য করা ও আত্মসমর্পণ করা। তাই এটা তাওহিদ ও ঈমানের ভেতরগত একটি অংশও। শুধু পূর্বশর্ত নয়।

সুতরাং বুঝ আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তের দিকে পৌঁছায় যে, প্রকৃতপক্ষে তাওহিদ শুধু শাহাদাহ উচ্চারণ করা নয়। বরং তা হল তার শব্দগুলো জানা, অর্থগুলো বিশ্বাস করা, স্বীকারোক্তি দেওয়া ও সে অনুযায়ী আমল করা। যেমনটা ইবনুল কায়্যিম রহ. উল্লেখ করেছেন।

এ থেকে এ মাসআলা বের হয়ে আসে যে, যে অসম্পূর্ণ কথার কোন অর্থ নেই, তার কারণে আল্লাহ সাওয়াব দিবেন না। এর উদাহারণ হল: সুফীরা যে একক শব্দ 'আল্লাহ, আল্লাহ' বলে তাসবীহ জপে। এটা বিদআত। যেহেতু এটা কোন অর্থবোধক বাক্য নয়। একারণেই আপনারা দেখেন যে, সুন্নাহ দ্বারা বর্ণিত তাসবীহগুলো পূর্ণ বাক্য হয়। যেমন سبحان الله , (সুবহানাল্লাহ) الحمد لله,(আলহামদু লিল্লাহ) الله أكبر (আল্লাহু আকবার) এবং এ জাতীয় আরো বাক্যগুলো। কারণ কোন শব্দকে এমনি এমনি গঠন করা হয়নি। বরং নির্দিষ্ট কতিপয় অর্থ বোঝানোর জন্যই গঠন করা হয়েছে।

আমাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমাটাও এভাবেই বুঝতে হবে। এভাবেই আরবগণ বুঝেছেন, যারা উক্ত ভাষার লোক। একারণেই আমরা দেখি, শাফাআতের হাদিসে যা এসেছে- "যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে"- এর বিপরীতে স্বয়ং বুখারী মুসলিমের মত সহীহ হাদিসের কিতাবগুলোতেই ভিন্ন শব্দেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন কোথাও এসেছে: من قال 'যে বলবে', কোথাও এসেছে: من عبد الله وكفر بما دونه 'যে আল্লাহর ইবাদত করে এবং অন্য সব কিছুকে

প্রত্যাখ্যান করে', কোথাও এসেছে: من وحد الله وكفر بما دونه 'যে আল্লাহকে এক মানে এবং অন্য সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করে'। এ সবগুলোই সহীহাইনের সুপ্রমাণিত হাদিস।

তাই শাহাদাতাইন হল তাওহিদের শিরোনাম। এটাই পরিপূর্ণ তাওহিদ নয়। বরং স্বয়ং কুরআনেই সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে এ বিষয়টিকে পরিস্কার করা হয়েছে। সেখানে 'কালিমা'র ব্যাখ্যা এসেছে এভাবে: আল্লাহ বলেছেন -

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

"তুমি বলে দাও, হে কিতাবী সম্প্রদায়! তোমরা এমন কালিমার দিকে আসো, যেটা আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে একই রকম। তা হল 'আমরা আল্লাহ ব্যতিত কারো ইবাদত করবো না, তার সাথে কাউকে শরীক করবো না এবং আমাদের একদল আরেকদলকে রব রূপে গ্রহণ করবে না।' অত:পর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক: আমরা মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত।"

তাই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যে কালিমা রেখে গেছেন, তা হল তাওহিদের কালিমা বা কালিমাতুস সাওয়া বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দেয়া। আর তা হল: আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা এবং তার সাথে কাউকে শরীক না করা। শুধু মুখে উচ্চারণ করা নয়। সুতরাং যে এ থেকে কম করবে, তার তাওহিদ বাস্তবায়িত হবে না।

কিন্তু কেউ বলতে পারে, এটা তো প্রকৃত ইসলামের হুকুম আরোপের ক্ষেত্রে, কিন্তু দুনিয়ার প্রকাশ্য অবস্থার ক্ষেত্রে কী হবে? আমরা কিভাবে, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের বিষয়গুলো বুঝবো? অর্থাৎ লোকটি যে দ্বীনের অনুশাসনকে মেনে নিয়েছে, সেটা কিভাবে বুঝবো?

আমরা বলবো: ঠিক আছে, প্রকৃত ইসলাম আর বাহ্যিক ইসলামের মাঝে পার্থক্য আছে। **আমরা দুনিয়াতে যত বিধি-বিধান প্রয়োগ করি, সেটা ব্যক্তির প্রকাশ্য কথা ও কাজের ভিত্তিতে। তার অভ্যন্তর বা নিয়তের ভিত্তিতে নয়। কারণ সবচেয়ে বড় সূত্র এবং শরীয়তের নীতি হচ্ছে "প্রকাশ্য কাজ"। তারপর অন্তরের বিষয়ের দায়িত্ব আল্লাহর হাতে। সুতরাং যার থেকে ইসলাম প্রকাশ পাবে, তাকে কলুষিতকারী কোন কিছু না পাওয়া যাবে, সে মুসলিম। আর যার থেকে ইসলাম প্রকাশিত হবে, কিন্তু নিশ্চিত কুফরও প্রকাশিত হবে, সে আমাদের নিকট মুসলিম নয়। এরপর তার দায়িত্ব আল্লাহর হাতে। এটা আকিদা, ফিকহ ও উসূলে ফিকহের একটি স্বীকৃত ও সুসাব্যস্ত বিষয়।**

এখন কেউ যদি বলে - তাহলে যে আমাদের সামনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্য দেয়, শুধু তাই নয়; ইসলামের কিছু প্রতীকও ধারণ করে, এবং নিজের ইসলামের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের সাক্ষ্য পেশ করে, তাকে তো স্বয়ং এই সূত্রের ভিত্তিতেই মুসলিম বলে গণ্য করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

তার উত্তরে আমরা অকাট্যভাবে বলবো: শরীয়ত এমনটাই বলে। এর বিপরীত বলে কেবল খারিজীরা। কিন্তু জটিলতা সৃষ্টি হবে সে সময়, যখন স্বয়ং এ ব্যক্তিই এমন বিষয়ের সাথে যুক্ত হবে, যা তার স্বীকারোক্তি ও আনুগত্য না থাকাকে প্রকাশ করবে - অর্থাৎ তার তাওহিদকে কলুষিত করে।

এমতাবস্থায় কোন বাহ্যিক অবস্থাকে আমরা কার্যকর ধরবো?

সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ব্যক্তি কোন নিশ্চিত শিরকের সাথে জড়িত হওয়ার দ্বারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। এমনকি কেউ যদি ইসলামের সমস্ত বিধি-বিধানগুলোও পালন করে, তথাপিও। যেমন ধরুন একজন পর্দার বিধানকে অস্বীকার করে, অথচ সে নামায পড়ে, রোজা রাখে এবং প্রতি বছর বাইতুল্লায় হজ্জ করে, তাহলে সে কাফির। আল্লাহকে অস্বীকারকারী। সে তার স্বীকারোক্তিকে যথাযথভাবে পূর্ণ করেনি।

এ হিসাবেই উলামায়ে কেরাম ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করেছেন। কেউ কেউ সবগুলোকে সংক্ষেপে দশটি বিষয়ের মধ্যে নিয়ে

এসেছেন। যদিও বিশ্লেষণ ও সংক্ষেপণের ক্ষেত্রে সংখ্যা পরিবর্তন হয়ে যায়। পাঠকদের জন্য সে সকল ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয় ও তার সীমাগুলো জানা অত্যন্ত জরুরী। আমি স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধের মধ্যে তার ব্যাখ্যা করেছি। বিষয়টির গুরুত্বের কথা ভেবে এখানে টিকায় সেই পূর্ণ আলোচনাটি তুলে ধরছি[১]।

---

১. ঐ সকল ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে,'নাকিয' (বা 'ভঙ্গকারী') এর ভিত্তিগত অর্থ হল: সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মৌলিকভাবে ইসলাম ধর্মের উপর ছিল। এ বিষয়টিই তাকে আসলি কাফের থেকে যৌক্তিকভাবে এবং বিধানগতভাবে পার্থক্য করে দেয়। সুতরাং উভয়টির মাঝে মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলা যাবে না।

আরেকটি বিষয় হল, শরয়ী মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি মূলনীতি হল, যাহির (বাহ্যিক অবস্থা) বাতেনের (আভ্যন্তরীণ অবস্থার) অনুকূল হয় এবং যাহিরের ভিত্তিতেই বিধান আরোপ করা হয়। বাতেনী বিষয় জানার কোন উপায় নেই। এজন্য হাকিম, কাযী বা মুফতির উপর আবশ্যক হল, সবগুলো বাহ্যিক সম্ভাবনার ব্যাপারে এমনভাবে চিন্তা করা, যা কখনো আভ্যন্তরীণ গোপন অবস্থার বিপরীতও হতে পারে) যাতে ভিন্ন কোন কারণ বা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর কোন সুযোগ না থাকে। যদি এমনটা করা হয়, তবে যাহির বাতেনের অনুকূলই হবে, যদিও সরাসরি বাতেনের ব্যাপারে অবগত হওয়া যায় না।

আমাদের উপরোক্ত কথা মুরজিআদের কথার মত নয়, কিংবা মুরজিআদের ঐ সকল ফকীহদের কথার মতও নয়, যারা প্রকাশ্য কুফরী অবস্থাকে আভ্যন্তরীণ কুফর থেকে ভিন্ন জিনিস মনে করে। অর্থাৎ যারা মনে করে, যদি আভ্যন্তরীণভাবে কাফের না হয়, তাহলে প্রকাশ্যভাবে কাফের আখ্যায়িত করা যাবে না। এটি জাহমিয়াদের আকীদা। এটি একটি নিকৃষ্ট বিদআত। আমরা যেটা গুরুত্ব দিয়ে বলি, তা হচ্ছে, যদি প্রকাশ্যভাবে এমন সমস্যা ঘটে, যা সঠিক হওয়ার কোন ব্যাখ্যাই করা যায় না, তখন আবশ্যিকভাবে বাতেন (আভ্যন্তরীণ ঈমান) অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

প্রথম ভঙ্গকারী বিষয়: এক আল্লাহর সাথে শরীক করা, যার সাথে কোন শরীক নেই। এর দলিল আল্লাহর বাণী-

إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না (আন-নিসা:১১৬)

বড় শিরক হল সবচেয়ে বড় জুলুম। এজন্য তার প্রতিফল জাহান্নাম ব্যতিত কিছু নয়, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। কখনো তাদের থেকে আযাব বন্ধ করা হবে না। যে সমস্ত মুশরিকদের শিরকের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তারা হল ইহুদী, খৃষ্টান, কুরাইশ গোত্রের মূর্তিপূজারী কাফেরগণ, অগ্নিপূজক এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্য থেকে কয়েকটি। যেমন- আদ, সামুদ, লূত, ইবরাহীম ও তুব্বার সম্প্রদায়।

এগুলোর বিপরীতে, শিরকে আকবার থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল ইসলাম। যে ইসলাম ব্যতিত

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না (আলে-ইমরান, ৮৫)

কুরআনে যে শিরককে নিষেধ করা হয়েছে, তা হল শিরকে আকবার। যা বুঝা যায় সম্বোধনের ধরণ ও পূর্বাপর অবস্থা থেকে এবং এর কর্তাকে সর্বনিকৃষ্ট বিশেষণে উল্লেখ করার দ্বারা। সুতরাং এটা হল শিরকের চূড়ান্ত রূপ। কিন্তু শিরকের এমন কিছু রূপও রয়েছে, যেগুলো দ্বারা একজন লোক ধর্ম থেকে বের হয় না। যেগুলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর উলামাগণ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তার মধ্য থেকে কয়েকটি হল: আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নামে শপথ করা, গণকদের কথাবার্তা শোনা, মুমিনদের মধ্যকার বিদ্রোহমূলক যুদ্ধ (সূরা হুজুরাত, ৯, রিয়া তথা প্রদর্শন করা। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ যে সমস্ত শিরক করে ইত্যাদি। ইবনে আব্দুল বার রহমাতুল্লাহে আলাইহি এমন অনেকগুলো উল্লেখ করেছেন। মোটকথা, শিরক শব্দটি কখনো শিরকে আকবার এবং কখনো আসগর এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে আসগার এর অর্থে কেবল সুন্নাহতে এসেছে। কুরআনের কোথায়ও এ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

এই দৃষ্টিতে ইসলাম বা তাওহিদ শব্দ দু প্রকার শিরকের বিপরীত নয়। কারণ ইসলাম, ঈমান ও ইহসানকে না করে না। বরং উভয়টিকেই অন্তর্ভূক্ত করে। অথচ শিরকে আকবার, যেটা তাওহিদের বিপরীত, সেটা যৌগিক বিষয় নয়। বরং সেটার একটাই প্রকার, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়। বস্তুত শিরকে আসগারকে শুধু নাম হিসাবেই শিরক বলা হয়, উক্ত অপরাধটির ভয়বাহতা বুঝানোর জন্য।

দ্বিতীয় ভঙ্গকারী বিষয়: যে নিজের মাঝে আর আল্লাহর মাঝে বিভিন্ন মাধ্যম দাঁড় করায়, যাদের নিকট সে প্রার্থনা করে বা সুপারিশ কামনা করে, সে সর্বসম্মতভাবে কাফের হয়ে যায়।

এটি নি:সন্দেহে শিরকের দরজাসমূহ হতে অন্যতম একটি দরজা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কুরআনে এটাকে স্পষ্টভাবে শিরক হিসাবে উল্লেখ করেছেন:

"আমরা কেবল এজন্যই তাদের 'ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।"(আয-যুমার, ৩)

"এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।" (ইউনুস, ১৮)

"আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা কক্ষনো একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, এজন্য তারা সবাই একত্রিত হলেও। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তারা তার থেকে তা উদ্ধারও করতে পারে না, প্রার্থনাকারী আর যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়েই দুর্বল।" (হাজ্জ, ৭৩)

হাদিসের মধ্যে এসেছে- দুআই ইবাদত।

সুপারিশ কামনা করা বা মাধ্যম গ্রহণ করার কতগুলো সুনির্দিষ্ট রূপ আছে:

কবরের অভিমুখী হয়ে কবরবসারীর নিকট প্রার্থনা করা, যেন কবরবাসী প্রার্থনাকারীর কল্যাণ সাধণ করে দেয়।

কবরের অভিমুখী হয়ে কবরবাসীর নিকট দুআ করা, যেন কবরবাসী আল্লাহর নিকট তার জন্য দুআ করে, যেন আল্লাহ তার কল্যাণটি সাধন করে দেন।

কবরের অভিমুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা, যেন আল্লাহ তার কল্যাণটি সাধন করে দেন।

প্রথম রূপ ও দ্বিতীয় রূপের কর্তা কাফের হওয়ার ব্যাপারে অনেক আলেমই ইজমা বর্ণনা করেছেন। এমন ব্যক্তি থেকে তাওবাহ চাওয়া হবে। প্রথমত তার সামনে দলিল প্রতিষ্ঠিত করা হবে। কারণ হতে পারে সে অজ্ঞতার কারণে মাযুর। বিশেষ করে যেহেতু এই বিদআতগুলো প্রতিটি দেশের প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। অত:পর যদি সে প্রত্যাখ্যান করে তবে তাকে হত্যা করা হবে।

পক্ষান্তরে তৃতীয় রূপটির ব্যাপারে কেউ কেউ মতবিরোধ করেছেন। উলামায়ে কেরামের একদল এটাকেও প্রথম দুটির মত গণ্য করেছেন। আর জুমহুর উলামাগণ এবং আমরা যে মত গ্রহণ করি তা হল, এটি একটি হারাম বিদআত। যা ধীরে ধীরে শিরকের দিকে পৌঁছে দেয়। কারণ উক্ত ব্যক্তি যে কাজটিতে লিপ্ত হয়েছে তার বাস্তবতা এটাই যে, সে দুআ করার স্থান এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পরিবর্তন করে ফেলেছে। কবরের জায়গাকে পবিত্র মনে করে তার পাশে দুআর জন্য বসেছে। অর্থাৎ তার ধারণামতে এটা

কা'বা শরীফে বা মসজিদে নববীতে দুআ করার মত। এটি একটি বিদআত। যেমন ইবনে তাইমিয়া রহ. ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, এমনটা সালাফ থেকে বর্ণিত নেই। তিনি এটাকে হারাম বিদআত মনে করেন। যা থেকে নিষেধ করা হবে এবং এর কর্তার উপর কঠোরতা করা হবে। যেহেতু এটি শিরকের একটি দরজা।

শাইখুল ইসলাম রহ. এর বর্ণনাটি তার ভাষায়: "দ্বিতীয় হল, কবরের নিকট দুআ করা। যার দ্বারা একথার প্রতি ইঙ্গিত হয় যে, ওখানকার দুআ অন্যান্য জায়গার দুআ অপেক্ষা অধিক মকবুল। এই প্রকারটি নিষিদ্ধ। হয়ত হারাম অথবা এতটা অপছন্দনীয়, যা হারামের সর্বাধিক নিকটবর্তী। উভয় বিষয়ের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট।" তার এই বর্ণনাটি টিকাকারদের জন্য যেকোন অপসুযোগের পথ বন্ধ করে দেয়।

তৃতীয় ভঙ্গকারী বিষয়: যে মুশরিকদেরকে কাফের বলে না বা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে বা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের। এই ভঙ্গকারী বিষয়টির ব্যাপারে সাধারণভাবে ঐক্যমত্য রয়েছে। তবে এর বিশ্লেষণ করা এবং এর প্রতিটি অংশের ব্যাপারে পৃথকভাবে চিন্তা করা আবশ্যক। কারণ এর কোন কোন অংশ সবার নিকট অকাট্যভাবে স্বীকৃত হলেও কোন কোনটা আবার সবার নিকট স্বীকৃত নয়।

যেটা সবার নিকট অকাট্যভাবে স্বীকৃত, তা হল কুরআনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত দলগুলোর কুফর। যেমন ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক, মুলহিদ (যারা আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে)। যে এ সকল সুনির্দিষ্ট দলগুলোকে কাফের আখ্যায়িত করবে না বা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে বা তাদের ধর্মকে সঠিক বলবে সে আল্লাহর সাথে কুফরী করল এবং সর্বসম্মতিক্রমে নিজ দ্বীন থেকে বের হয়ে গেল। এমনিভাবে পূর্ববর্তী ভঙ্গকারীর আলোচনায় আমরা যে দুটি রূপের কুফরীর সিদ্ধান্ত দিয়েছি, সেগুলোর ব্যাপারে দ্বিমত করলেও কাফের হয়ে যাবে। যদিও উভয়টির মাঝে এই পার্থক্য আছে যে, ঐ সকল দলগুলোর মাঝে মৌলিক দিক থেকে সুনির্দিষ্টভাবে কুফর প্রমাণিত আর পূর্বোল্লিক্ত ভঙ্গকারী বিষয়ের প্রথম দুটি রূপের ক্ষেত্রে কুফর সাব্যস্ত হয় প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর। যদিও সত্তাগত কুফরটি সন্দেহাতীতভাবেই সাব্যস্ত।

কিন্তু যেগুলো ইজতিহাদের মাধ্যমে কুফর সাব্যস্ত হয়, কিংবা যেগুলো কুফর সাব্যস্ত হওয়া কিতাব-সুন্নাহয় উল্লেখিত কোন কারণের উপর নির্ভরশীল হয়, যে কারণটা আমলের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর মধ্যে কুফর সাব্যস্ত হবে দুটি শর্তের ভিত্তিতে:

প্রথমত: গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরামের ঐক্যমত্যে উক্ত কাজটি সূচনাগতভাবেই কুফর হতে হবে।

দ্বিতীয়ত: তার কর্তার উপর শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অজ্ঞতার ওযর দূর করতে হবে। চাই তা ইলমের এমন প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে হোক, যার কারণে অজ্ঞতার কোন সুযোগ বাকি থাকে না। যেমন নামাযকে সম্পূর্ণ অস্বীকারকারীর কুফর বা যে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের বিপরীতে আইন রচনা করে তার কুফর। অথবা ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে হোক। **তবে প্রমাণ পৌঁছা আর প্রমাণ বুঝা দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। প্রমাণ বুঝা হল আল্লাহপ্রদত্ত হেদায়াত। এখানে শর্ত হচ্ছে শুধু প্রমাণ পৌঁছা।** যেমনটা আমি আমার কিতাব "আলজাওয়াবুল মুফিদ" এ উল্লেখ করেছি।

আমি এই শাখাগত মাসআলাটিকে এই সূত্রের দিকে সম্পৃক্ত সম্বন্ধিত করেছি-"যে কাফেরদেরকে কাফের বলে না সে কাফের। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে, উপরোল্লেখিত প্রথম প্রকার কুফরের ক্ষেত্রে এই সূত্রটি সাধারণ ও ব্যাপকভাবেই সঠিক। তবে দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে এর বিশদ বিশ্লেষণ ও কারণ উদঘাটন করা আবশ্যক হবে।

বর্তমানের হারুরীয়্যাহ সম্প্রদায় হাজিমিয়্যাহরা এখানে কুফরের আরেকটি ভিত্তি বা উৎস যোগ করেছে। তা হল -যে মুশরিকদেরকে কাফের বলে না, তাকে যে কাফের বলে না সেও কাফের। এটা হল আরেকবার অবশ্য-ফলাফলের ভিত্তিতে (লাযিম) তাকফীর করা। এটি ব্যাপকভাবে সঠিক না। শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পরে সাব্যস্ত হতে পারে।

চতুর্থ ভঙ্গকারী বিষয়: যে এই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ ব্যতিত ভিন্ন কোন আদর্শ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ থেকে পূর্ণাঙ্গ, অথবা অন্য কারো হুকুম বা বিচার তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম হতে উত্তম সে কাফের। এটা সর্বসম্মতিক্রমে ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়। **এখানে হুকুম দ্বারা শুধু বিচারকার্য সম্পদান করা উদ্দেশ্য নয়। বরং সাধারণ ও ব্যাপক আইন প্রণয়ন করা উদ্দেশ্য।** কারণ অনেক সময় নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে শরীয়ত বিরোধী এক বা একাধিক বিচার করার উপর কাউকে বাধ্য করা হতে পারে বা কেউ অনন্যোপায় হতে পারে। একারণে এর সাথে - 'যে বিশ্বাস করে'- এ কথাটিকেও যোগ করা হয়।

ই'তিকাদ বা বিশ্বাস করার কাজটি জানা ও সত্যায়ন করার সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হয়। অত:পর সত্যায়ন হয়ত এত সুদৃঢ়ভাবে হবে যে, তা নিজে নিজেই আমল গ্রহণ করে নেওয়াকে আবশ্যিক করবে। এটা হল ঈমানের ক্ষেত্রে আবু হানিফা রহমাতুল্লাহে আলাইহি এর মাযহাব। অথবা সত্যায়ন এত সুদৃঢ় হবে না। বরং পৃথকভাবে আমলের নিয়ত করা বা আমলকে গ্রহণ করে নেওয়া আবশ্যক হবে।

কিন্তু তাসদীক বা সত্যায়ন যে অর্থেই হোক, আল্লাহর শাসনব্যবস্থা ব্যতিত ভিন্ন কোন শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর উত্তম মনে করা সন্দেহাতীতভাবে কুফর। আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের বাইরে আইন রচনার করা স্বরূপ সকলের জানা। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রূপটিই আমাদের যামানার ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদের ভিত্তি। এর সাথে সম্পর্ক রেখেই রাজনীতিতে গণতন্ত্র, অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ এবং সমাজনীতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা গড়ে উঠেছে। এ সবগুলোই এক উৎস থেকে সৃষ্ট। তা হল আসমানী ওহীকে প্রত্যাখ্যান করে মাখলুকের জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি ঝুকা। চাই যে-ই হোক না কেন।

এ থেকেই আমরা বলি, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতিত ভিন্ন বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া সত্তাগতভাবে কুফর। এর ব্যাপারে অনেক আয়াত সর্বোচ্চ ব্যাপকতার সাথে নাযিল হয়েছে।

কিন্তু বিতর্কের বিষয় হল, কোন্ কোন বিষয় এই সন্তুষ্টি বুঝাবে?

রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে বা সমাজনীতিতে গণতন্ত্রের কোন উপাদান গ্রহণ করার মধ্যে গণতন্ত্রের প্রতি এক প্রকার সন্তুষ্টির ইঙ্গিত রয়েছে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা কুফর হওয়ার জন্য আবশ্যিক হল গণতন্ত্রের মূল বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হতে হবে। তা হল অন্য কারো বিধানকে আল্লাহর বিধানের উপর প্রাধান্য দেয়া। অর্থাৎ লক্ষ্য ও মাধ্যমের মাঝে সম্পর্ক স্পষ্ট করতে হবে। গণতন্ত্রের একটি রূপ বাস্তবায়ন করা আর তার মূল উৎস তথা আল্লাহর হুকুম ব্যতিত ভিন্ন হুকুম উত্তম ও উপযুক্ত হওয়া এবং জনগণের কর্তৃত্ব জনগণের নিজের হাতে থাকা; আল্লাহর হাতে না থাকার বিশ্বাস করার মাঝে সম্পর্ক স্পষ্ট করতে হবে এবং একথা সুনিশ্চিত হতে হবে যে, মূল বিষয়টি বুঝার ক্ষেত্রে তার কোন অস্পষ্টতা নেই। যা বাহ্যত শূরার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকদের নিকট অনেক সময়ই সংশয়পূর্ণ হয়ে যায়।

এমনিভাবে পুঁজিবাদ বা সমাজবাদ চালু করার মাঝেও এই ইঙ্গিত রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার মাঝে ঐ সকল লেখকদের কথাগুলোর বাস্তবতা না পাওয়া যায়, যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে লিখেছে এবং রাজনীতি শুধু তার ব্যক্তিগত জীবনের সাথেই সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ পুঁজিবাদী মতবাদটি কিছু কিছু শাখাগত বিষয়ে ইসলামী অর্থনীতির সাথে মিল রাখে। তবে এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই।

এমনিভাবে সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি ধর্মনিরপেক্ষতার মাঝেও কখনো ইসলামের সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমন ব্যক্তির স্বাধীনতা ও পছন্দের সম্মান করা। এমনকি ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতারও সম্মান করা। (যেমনটা আল্লাহ বলেছেন-"দ্বীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি

নেই”) কিন্তু এই স্বাধীনতার স্বরূপ, সীমারেখা এবং সামাজিক অধিকারের সাথে এর সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়টি ভিন্ন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক অধিকারের বিরাট অংশ ব্যক্তি স্বাধীনতার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। একেবারে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার অস্তিত্ব বিরাজমান থাকে।

পঞ্চম ভঙ্গকারী বিষয়: যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনিত কোন বিষয়কে ঘৃণা বা অপছন্দ করে -যদিও তার উপর আমল না করা হয়- সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যাবে। সরাসরি কাফেরের মাঝে যে মৌলিক ঘৃণা ও অপছন্দনীয়তা থাকে, এটাও হুবহু তার থেকেই সৃষ্ট। কাফেরদেরকেই দেখবেন আল্লাহর কুরআনকে অপছন্দ করে-

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

“এক আল্লাহর উল্লেখ করা হলেই যারা ক্বিয়ামতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় ভরে যায়।” (আয-যুমার,৪৫)

এটাই অপছন্দনীয়তার ফলাফল। যেমন আল্লাহ তা’আলা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন। (সুরা মুহাম্মদ, ৯)

ঘৃণা ও অপছন্দ একটি আভ্যন্তরীণ বিষয়। বাহ্যিক কোন ইঙ্গিত বা আলামত ছাড়া তা বুঝা সম্ভব নয়। যে এটা করে, কিন্তু তার থেকে প্রকাশ্য কোন কিছু দেখা না যায়, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকট কাফের হবে। যেমন যে বিষয়ের উপর আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার মাধ্যমে দলিল দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়কে অবজ্ঞা করা বা যেখানে তাদের একটি বাণী থাকা প্রয়োজন, সেখান থেকে তা উঠিয়ে দেওয়া বা মুখে এমন কাজ করা বা হাতে এমন ইশারা করা, যা সকল মানুষই বুঝে যে, এটা অসম্মান করার জন্য।

তবে নির্দিষ্ট কোন আলেমের থেকে বর্ণিত কথাকে অপছন্দ করা এর অন্তর্ভূক্ত হবে না। উদাহরণ স্বরূপ- ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. যা বলেছেন বা শাওকানী যা বলেছেন তা অপছন্দ করার কারণে এটা বলা যাবে না যে, এটার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথাকেই অপছন্দ করা হয়েছে। কারণ এটা তাকফীর বিল লাযিম- অর্থাৎ অবশ্য-ফলাফলের ভিত্তিতে তাকফীর করা।

ষষ্ঠ ভঙ্গকারী বিষয়: যে দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে বা সাওয়াব ও শাস্তি নিয়ে উপহাস করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। উপহাস করার প্রকৃত অর্থ হল, হালকা করা, সম্মানহানী করা, মান কমানো, তুচ্ছ করা ইত্যাদি। সুতরাং সম্মানের সাথে কখনোই ঠাট্টা হতে পারে না। দু'টি কখনো একত্রিত হতে পারে না। যেমনটা ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহে আলাইহি "আসসারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল" এ বলেছেন। এটা মানুষের মাঝেও জানাশোনা ও সচারাচর ঘটিত একটি বিষয়। এর প্রমাণ হল যা আল্লাহর বাণীতে এসেছে-

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّـهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো তবে তারা অবশ্যই বলে দিবে যে, আমরা তো আনন্দ-ফূর্তি ও কৌতুক করছিলাম। বল, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শনাবলী ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে?! তোমরা অজুহাত দেখিও না। তোমরা ঈমানের পর কুফরী করেছো।" (আত-তাওবাহ, ৬৫,৬৬)

ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, জনৈক মুনাফিক ব্যক্তি তাবুক যুদ্ধের ব্যাপারে বলল: আমি যুদ্ধের সময় এই লোকগুলোর মত ভীতু, মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ আর কাউকে দেখিনি। তার উদ্দেশ্য হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন একজন সাহাবী বললেন: তুমি মিথ্যা বলেছো। নিশ্চয়ই তুমি মুনাফিক। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিতে গেলেন। কিন্তু দেখলেন তার আগে কুরআনই জানিয়ে দিয়েছে।

অত:পর ওই মুনাফিক লোকটিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল। সে তার উষ্ট্রীতে আরোহী ছিল। বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা হাসি-কৌতুক করছিলাম এবং কাফেলার মধ্যে যেসকল গল্প-গুজব করা হয়, সেগুলো বলে পথ অতিক্রম করছিলাম।

সে বলছিল, আমরা আনন্দ-ফূর্তি ও কৌতুক করছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে?!

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে বা সে বাড়িয়ে যা কিছু বলেছে, তার প্রতি কর্ণপাত করলেন না। কারণ আল্লাহকে সম্মান করা হল ঈমানের মূল ভিত্তি। আর তাঁকে অসম্মান করা হল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে সূক্ষ্ম বিষয় হল, ঠাট্টা বা উপহাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা। এর কিছু কিছু উপাদান একটি আরেকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এর উদাহরণ হল, আমরা সম্প্রতিকালে যেটা দেখেছি যে, বর্তমানের হারুরিয়্যা সম্প্রদায় কর্তৃক আমেরিকা থেকে জিযিয়া চাওয়া নিয়ে কেউ কেউ উপহাস করেছে। আর উপহাসকারীরা এটাকে বলেছে এভাবে- তোমরা জিযিয়ার মাধ্যমে উপহাস করছো। অথচ সত্যকথা হল, এখানে জিযিয়া দাবিকারীকে নিয়েই ঠাট্টা করা হয়েছে। যা স্পষ্ট।

উপহাস ও গালি আল্লাহ, দ্বীন, ইসলাম সবকিছুইকেই অন্তর্ভূক্ত করে। এমনিভাবে আল্লাহর সৃষ্টি, যেমন ফেরেশতাদেরকেও অন্তর্ভূক্ত করে।

সপ্তম ভঙ্গকারী বিষয়: যাদু। সুতরাং যে এটা করবে বা এর প্রতি সম্মতি দিবে সে কাফের হয়ে যাবে। যাদুকরের কাফের হওয়ার দলিল সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। এটা ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহে আলাইহি ব্যতিত সকল ইমামদের মাযহাব। তিনি যাদুকরকে তার যাদু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাকেও শর্ত করেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী- "তারা কাউকে একথা না বলে শিখাতো না যে, আমরা হলাম পরীক্ষা স্বরূপ। তাই তোমরা কুফরী করো না।" (বাকারা, ১০২)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহে আলাইহি ফাতহুল বারীতে বলেন:

আয়াতের প্রকাশ্য অবস্থা এটাই যে, তারা এর দ্বারা কুফরী করেছে। আর কোন জিনিস শিখার দ্বারা তখনই কাফের হয়, যখন উক্ত জিনিসটিও কুফর হয়। যাদুকরের শাস্তি হল, তরবারী দিয়ে হত্যা করা, যেমনটা সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইন থেকে বর্ণিত। আর আরেকটি হাদিসের মধ্যে যা এসেছে- "যে কোন জ্যোতিষী বা গণকের নিকট আসে এবং তাকে বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের আনিত বিষয়কে অস্বীকার করল।" বর্ণনা করেছেন ইমাম চতুষ্টয় এবং তাকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন ইমাম হাকিম রহমাতুল্লাহে আলাইহি। উলামায়ে কেরাম এটাকে কুফরে আসগার হিসাবে গণ্য করেছেন। যাতে এই হাদিসের মাঝে আর সহীহ মুসলিমের নিম্নোক্ত হাদিসের মাঝে সমন্বয় করা যায়-

"যে গণকের নিকট আসে, তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করে ও তা বিশ্বাস করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল করা হবে না।"

এটা ঐ সকল বিষয়গুলোর অন্তর্ভূক্ত, যেগুলোর ব্যাপারে কুরআনে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আসার পর সুন্নাহয় তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন কুরআনে যাদুকে কুফরে আকবার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অত:পর সুন্না তার বিশদ বিবরণ পেশ করেছে। আর যদি এই বিশ্বাস করাটা সুদৃঢ় হয় যে, গণক বা জ্যোতিষী অদৃশ্যের সংবাদ জানে, তাহলে সে নি:সন্দেহে কাফের হয়ে যাবে। এমনটা না হলে তা কুফরে আসগার হবে। তখন এর দ্বারা গুনাহটির ভয়াবহতা বুঝানো ও তার থেকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য হবে।

অষ্টম ভঙ্গকারী বিষয়: আল ওয়ালা ওয়াল বারা (বন্ধুত্ব ও সম্পর্কোচ্ছেদ)। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য-সহযোগীতা করা। উলামায়ে কেরাম ওয়ালা ও বারা এর ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন যে, এটা কি তাওহিদের রুকন হিসাবে তার সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত, নাকি শর্ত হিসাবে তার বহিরাংশ? উভয় অবস্থায়ই এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলিমদের হত্যা ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করার কারণে এর কর্তা কাফের হওয়ার ব্যাপারে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। (মায়েদা, ৫১)

আল্লাহ আরো বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

আর যারা কুফরী করে, তারা একে অপরের বন্ধু। (আনফাল:৭৩)

এটা শরীয়তের একটি অবিচল অনড় ও অপরিবর্তনীয় বিষয়। যার ব্যাপারে সাধারণভাবে কারো দ্বিমত নেই।

কিন্তু ওয়ালা-বারা'র রূপ ও পদ্ধতি বিভিন্ন ধরণের। তার মধ্যে সর্বোচ্চ হল, যুদ্ধে কার্যগতভাবে সাহায্য করা। আমার পূর্বের প্রবন্ধ "তাসিসুন নযর"এ ব্যাপকতার বিভিন্ন রূপ এর আলোচনায় আমরা যা বলেছিলাম, এগুলো তারই উদাহরণ। সেখানে বলেছিলাম:" আওয়াদিয়াহ ও যারা তাদের সমর্থন করছে তাদের চিন্তার বিকৃতির একটি উদাহরণ দিবো ঐ সকল আয়াতগুলো দিয়ে, যেগুলো আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব

করার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কারণ এমন কোন বর্ণনা আসেনি, যা এগুলোকে সীমাবদ্ধ করবে বা তার রূপ নির্দিষ্ট করবে বা তার কোন পরিমাণ নির্ধারণ করবে। এগুলো এসেছে ব্যাপকতার দ্বিতীয় পদ্ধতিতে। মুতলাক নাহি এর শব্দে। من শব্দের মাধ্যমে এসেছে। যা উমুম তথা ব্যাপকতাও বুঝায় এবং শর্তও বুঝায়। আর যেগুলো শর্তের শব্দে এসেছে, সেগুলোও ইতিবাচক বাক্যে এসেছে। নেতিবাচক বাক্যে আসেনি। সুতরাং সীমাবদ্ধতা বুঝাবে না।

যেহেতু وَمَن لَّمْ يَحْكُم আয়াতে আমরা দেখিছি যে, হুকুমটিকে যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, সে কাফের হওয়ার জন্য তার বাইরের কোন বিষয়ের প্রয়োজন হয় না। আর সেই সীমাবদ্ধ বিষয়টি হল, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান দ্বারা শাসন না করা। এ কাজটি না করার দ্বারাই হুকুমটি সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরা আয়াতের শব্দই চূড়ান্ত হুকুমটি বুঝায়।

পক্ষান্তরে وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ আয়াতের হুকুম সাবস্ত হওয়ার জন্য আয়াতের বাইরের এমন বিষয় জানাও আবশ্যক হয়, যা কুফর বুঝাবে। এটাই প্রমাণ করে যে, আমরা কুরআনী বর্ণনার ব্যাপকতার যে দু’টি রূপ উল্লেখ করেছি, এটি তার প্রথম প্রকারের অন্তর্ভূক্ত।

এই দৃষ্টিতেই আমরা মনে করি, যে ওয়ালা’র আয়াতগুলো ব্যবহার করে তার দ্বারা এর চূড়ান্ত রূপের উপর দলিল দিবে সে সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে চলে যাবে এবং কুরআন বুঝা থেকে বঞ্চিত হবে। তবে যদি কুরআনের আয়াত ব্যতিত ভিন্ন কোন দলিলের মাধ্যমে তার উল্লেখিত ওয়ালা’র ভিত্তিটি প্রমাণিত হয় এবং জানা যায় যে, এটা কাফেরে পরিণতকারী ওয়ালা, তাহলে ভিন্ন কথা।

তাই আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো সাথে ওয়ালা (বন্ধত্ব স্থাপন) এর রূপ বিভিন্ন ধরণের থাকার কারণে তাকে দু’টি ভাগে ভাগ করতে হয়। একটি হল কাফেরে পরিণতকারী ওয়ালা। আরেকটি হল এমন ওয়ালা, যা শুধু গুনাহ অথবা বলতে পারেন আলওয়ালাউল আসগার। যা হারাম ও মাকরূহের মাঝামাঝি। তাহির ইবনে আশুর তার তাফসীর-আততাহরীর ওয়াততানওয়ীর-এ সূরা মায়িদার ৫১ নং আয়াতের তাফসীরে যা বলেছেন, তার সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও তা একাই অন্য সকল বর্ণনা থেকে যথেষ্ট হওয়ার কারণে এখানে আমি তা উল্লেখ করছি। তিনি বলেন:

من শরতিয়্যাহ। এটা দাবি করে, যে-ই বন্ধুত্ব করবে, সেই তাদের একজন হবে। তাদের সাথে বন্ধুত্ব করাকেই তাদের মধ্য থেকে গণ্য হওয়ার কারণ বানানো হয়েছে। বাহ্যত এটাই দাবি করে যে, সে তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে। বাহ্যিকভাবে, তথা আভিধানিক অর্থ হিসাবে। কারণ তাদের অংশ হওয়ার অর্থটা বাস্তবে পাওয়া যাবে, যখন সে তাদের ধর্মের

একজন হবে। কিন্তু যেহেতু একজন মুমিন যখন ঈমানের আকিদা রাখে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহির অনুসরণ করে এবং মুনাফিকী না করে, তখন সে অবশ্যই প্রকৃত অর্থেই মুমিন হয়, এজন্য আয়াতটির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। মুফাসসিরগণ এর নিম্নোক্ত দু'টি ব্যাখ্যার যেকোন একটি গ্রহণ করেন:

হয়ত আল্লাহর বাণী وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ এর মধ্যে ওয়ালায়াত বা বন্ধুত্বকে ওয়ালায়াতে কামিলাহ (পূর্ণাঙ্গ বন্ধুত্ব) হিসাবে ধরা হবে। অর্থাৎ ওয়ালায়াতের চূড়ান্ত রূপ। যা হচ্ছে, তাদের ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া, ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করা। একারণেই ইবনে আতিয়্যাহ রহ. বলেন: যে তাদের সাথে তাদের আকিদা ও ধর্মের বিষয়ে বন্ধুত্ব করে সে কুফরের ক্ষেত্রে এবং জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়ার ক্ষেত্রেও তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে। একটু সামনে গিয়ে তিনি বলেন: আহলুস সুন্নাহ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া এবং তাদের ধর্মের প্রতি ঝুকে যাওয়া থেকে কম বন্ধুত্ব হলে তার কারণে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাবে না। তবে এটা হবে মারাত্মক পথভ্রষ্টতা। বন্ধুত্ব যতটা শক্তিশালী হবে, পথভ্রষ্টতাও তত শক্তিশালী হবে। এটার কথাই আমরা আমাদের আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে, এটা ব্যাপকতার প্রথম রূপ অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। যা তার পরের সকল রূপগুলোকেও অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। তবে যে যুদ্ধের মধ্যে কাফেরদেরকে সহযোগীতা করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তার কাফের হওয়ার বিষয়টিকে ঈমান-আকিদার সাথে সম্পৃক্ত করবো না। বরং কোন ব্যাখ্যা ব্যতিত স্বয়ং তার কাজটিই কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তথাপি বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী আলামতের প্রতি লক্ষ্য রাখা হল ফিকহের পূর্ণতা।

অত:পর ইবনে আশুর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন, যা আমরা হুবহু তার শব্দে এখানে বর্ণনা করবো। তিনি বলেন:

"এসকল স্তরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হল, গ্রানাডার কিছু মুসলমানদের মাঝে যা ঘটেছে। তার সম্পর্কে ফকীহ মুহাম্মদ আলমাওয়াক, মুহাম্মদ ইবনুল আযরাক, আলী ইবনে দাউদ এবং গ্রানাডার আরো বিশাল সংখ্যক ফকীহকে জিজ্ঞেস করা হল। স্পেনের নেতৃবৃন্দ ও সৈন্যদের একটি গ্রুপ, যারা লিসানার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর খৃষ্টান দেশ কাশতালার অধিপতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অত:পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার সাহায্য গ্রহণ করে। এভাবে নিজ প্রতিবেশির রজ্জু আঁকড়ে ধরে খৃষ্টান দেশে বসবাস করতে থাকে। এখন কোন মুসলিমের জন্য তাদেরকে সাহায্য করা বা কোন শহরবাসী বা দূর্গবাসীদের জন্য তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া জায়েয হবে কী?

উলামায়ে কেরাম উত্তর দিলেন: কাফেরদের দিকে ঝুকা এবং তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করার কারণে তারা আল্লাহর এই আয়াতের ধমকির আওতাভূক্ত হয়ে গেছে- وَمَن

يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ সুতরাং যে তাদেরকে সাহায্য করল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে সাহায্য করল। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের কাজে অটল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটাই তাদের হুকুম। আর যদি তাওবা করে এবং নিজেদের অবস্থান থেকে ফিরে আসে তাহলে মুসলিমদের উপর তাদেরকে গ্রহণ করে নেওয়া আবশ্যক হবে।”

ইবনে আশুর মনে করেছেন, তারা যে কাজটা করেছে বা যেটা ‘ওয়ালার’ সবচেয়ে কঠিন রূপ, সেটা কুফর থেকে নিচে। তিনি বলেন: তারা যে তাদের ঘটনার জবাবে এই আয়াত দিয়ে উত্তর দিয়েছেন, এটাই প্রমাণ করে যে, তারা আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন- তারা ক্রোধ ও নিন্দার উপযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মত। তারা যা করেছে এবং যার সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরাম ফাতওয়া দিলেন এটা হল কুফরী বন্ধুত্বের পরে সবচেয়ে মারাত্মক বন্ধুত্ব।

সুতরাং বুঝা গেল, ফুকাহায়ে কেরাম এ রূপটি হারাম হওয়ার আকিদা পোষণ করেন, যদিও বড় কুফর গণ্য করেন না এবং তাওবা চাওয়া ব্যতিত তাদের তাওবা কবুল করার কথা বলেন।

এখানে প্রামাণ্য বিষয় হল, **গ্রানাডার ফুকাহায়ে কেরাম কর্তৃক এই কাজটিকে সত্তাগতভাবে কুফর গণ্য না করার মধ্যে আপত্তি আছে।** তা হল এই রূপটি প্রকাশ্যভাবেই আভ্যন্তরীণ কুফর বুঝায়। (অর্থাৎ এই কাজটির উপস্থিতিই অভ্যন্তরীন কুফর বুঝায়) তবে যদি এভাবে দলিল পেশ করে যে, তাদের প্রকাশ্য কথা ও অবস্থা বলছিল, শাহাদাত উচ্চারণ, নামায আদায় ও অন্যান্য কারণে তারা এখনো মুসলিম আছে। তাহলে এ দু’টি পরস্পর সংঘর্ষপূর্ণ অবস্থা। এ মতটির যদিও একটা যুক্তি আছে, কিন্তু আমরা আর প্রবক্তা নই। যদিও এর মাধ্যমে আমরা এই দলিল দেই যে, ওয়ালা’র বিভিন্ন স্তর আছে ও তা হারাম ও কুফর হওয়া নিয়ে মতবিরোধ করার সুযোগ আছে।

একারণে বর্তমান যামানায় যে সকল ফকীহ ও আলেমগণ নতুন ঘটনাবলীর ব্যাপারে ফাতওয়া দিতে চান, তাদের উপর আবশ্যক হল ওয়ালার বিভিন্ন রূপগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা। যেমন কিছু আছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ওয়ালা, যেমন কাফেরদেরকে যুদ্ধে সাহায্য করা। আবার কিছু আছে সর্বনিম্ন পর্যায়ের, যেমন-ব্যবসায়, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাফেরদের সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করা। আমি আমার প্রবন্ধ “রফউশ শুবুহাত আম মাওয়ুয়িল ওয়ালা ওয়ালবারা” এর মধ্যে ওয়ালা’র বিভিন্ন রূপগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। তাই পাঠক তার স্মরণাপন্ন হতে পারেন।

নবম ভঙ্গকারী বিষয়: যে এই আকিদা রাখে যে, কিছু কিছু লোকের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা আবশ্যিক নয়, তাদের জন্য তাঁর শরীয়ত

থেকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে, যেমনিভাবে খিযির আলাইহিস সালামের জন্য মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়ত থেকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল, সে কাফের।

সাধারণত এই আকিদাটা সৃষ্টি হয় সুফিবাদী ও রাফেযীদের মাঝে। তারা মনে করে, তাদের ওলীগণ ও তাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উম্মতগণ নবীদের থেকেও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এটা কোন সন্দেহ ব্যতিত নিরেট কুফর। কারো জন্যই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত থেকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগই নেই। গোটা শরীয়ত থেকেও না, অনু পরিমাণ অংশ থেকেও না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وخاتم النبيين

এমনিভাবে আরেক স্থানে বলেছেন

إن الدين عند الله الإسلام

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম। (আলে ইমরান, ১৯)

এখানে দ্বীন বলতে তার সকল বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি উদ্দেশ্য। এই যামানার আওয়াদিয়াদের (আবু বাকর আল-বাগদাদি ইব্রাহিম আওয়াদ এর অনুসারী) সৃষ্ট একটি বিদআত হল, তাদের বক্তা মিম্বারের উপর দাড়িয়ে বলে: যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এখন পুনরায় জীবিত করা হত, তাহলে তার জন্যও দাওলার অনুসরণ না করার সুযোগ থাকত না। এটা প্রকাশ্য কুফর, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।

দশম ভঙ্গকারী বিষয়: আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমূখতা অবলম্বন করা। তা না শিখা ও তার উপর আমল না করা। বিমূখতার কুফর হল, উলামায়ে কেরামের মাঝে আলোচিত কুফরের চার রূপের একটি রূপ। অবিশ্বাসের কুফর, অজ্ঞতার কুফর, অহংকার ও হঠকারিতার কুফর এবং বিমূখতার কুফর। বর্তমানে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রূপটি হল বিমূখতার কুফর। তাওহিদের কালিমা পাঠকারী ব্যক্তি সকল প্রকার ওয়াজিব বা মানদুব আমল থেকে দূরে থাকা। কুরআন তেলাওয়াত করা হলে বা যে হাদিস মুসলিম সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা পাঠ করা হলে তার প্রতি সামান্য গুরুত্ব না দেওয়া, এমনকি ভ্রুক্ষেপও না করা। সে হল আল্লাহর আদেশ ও তার দ্বীন থেকে পরিপূর্ণ বিমূখতা অবলম্বনকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا

যেহেতু ইমান ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার কাজটি প্রকাশ্য, তাই দুনিয়াতে কারো উপর হুকুম আরোপ করার ক্ষেত্রে তা বিবেচনা করা আবশ্যিক। কোন মুফতি বা কাজীর পক্ষে এগুলো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না। যেমন কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল, কিন্তু তারপর সে কুরআন শরীফ পুড়িয়ে দিল বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিল।

এখানে যে ব্যাপারটাতে আমরা মুরজিয়াদের থেকে আলাদা হয়ে যাব, বিশেষ করে এ যুগে, তা হলো আল্লাহর শারীয়াহ অনুযায়ী বিচার ও শাসন ছেড়ে দেয়া - এটা ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় না?

আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যাকে স্বীয় রবের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (আস-সাজদাহ, ২২)

নি:সন্দেহে এটা এমন একটি আমল, যার সাথে এই ব্যক্তির অন্তরে ঈমান বা ইসলাম থাকার কোন সুযোগ থাকে না। এটা নিরেট কুফর। “সকল আমল বর্জনকারীর কুফর” এর মত। আমি আমার কিতাব হাকিকাতুল ঈমানে কিছুটা বিস্তারিতভাবে এর আলোচনা করেছি।

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, নির্দিষ্ট করে কাউকে বিমূখ বলা। কারো পক্ষ থেকে অন্য কারো ব্যাপারে এরূপ বলা যে, সে এই ধরণের বিমূখ-এর জন্য আবশ্যিক হল দীর্ঘস্থায়ীভাবে ঐ ব্যক্তির সান্নিধ্যে থাকা এবং বিভিন্ন উপলক্ষে তার নিকট বেশি বেশি যাওয়া। যেন তার বিমূখতার প্রকৃত অবস্থা জানা যায়। কারণ আমাদের কল্পনাগুলো কখনো কখনো এক বা একাধিক বিচ্ছিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে হাকিকতের সাথে মিলে না। তাই এটা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

এ ছিল দশটি ভঙ্গকারী বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা, যেগুলো শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব ইলম ও হকের সাথে সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন সাধারণভাবে, কিন্তু আমরা বর্তমানে যে চরম অজ্ঞতা এবং মুসলিম দাবিকারী লোকদের মাঝে চরম বিকৃতি দেখছি তা অত্যন্ত ভয়াবহ বিষয়, যা মুসলিমদেরকে একদিকে সীমালঙ্ঘন ও অন্যদিকে হারুরিয়্যাহ মতবাদের খপ্পরে ফেলে দিচ্ছে। ফলে অজ্ঞ ও উদাস লোকেরা কোন যোগ্যতাবিহীন একদল তর্কশাস্ত্রবিদের অনুসরণ করছে। বস্তুত আল্লাহই তাওফিকদাতা এবং তিনিই সঠিক পথপ্রদর্শনকারী।

২) সর্বসম্মত ও নিখাদ কুফরে লিপ্ত হওয়ার পরও কি কারো প্রকৃত ইসলাম বাকি থাকতে পারে?

আমরা জানি যে, ইসলামের দাবি করার একটি সর্বনিম্ন সীমা আছে। তা হল তাওহিদ বাস্তবায়ন করা বা কালিমাতুস সাওয়ার দিকে আসা বা ইজমালী ঈমান আনয়ন করা বা কালিমায়ে শাহাদাহ এর বিষয়বস্তু ও তার দাবিসমূহ গ্রহণ করে নেওয়া, তার স্বীকারোক্তি দেওয়া, তার নিকট আত্মসমর্পণ করা ও আনুগত্য করা। এমন বিশ্বাস ও অন্তরের কাজের মাধ্যমে, যা প্রতিটি আমলকে পৃথক পৃথকভাবে ও সমষ্টিগতভাবে মেনে নেওয়াকেও আবশ্যক করবে।

তারপরে আসে আদিষ্ট বিষয়গুলো পালন করা ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকার মাসআলা। এটা হল ওয়াজিব ঈমান, যা মুসলিমদের একেকজনের একেক রকম হয়। যা বেশি থেকে বেশি অর্জন করার জন্য মুসলিমগণ সারা জীবনই চেষ্টা করে যায়।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি আমাদের আরো বুঝতে হবে যে, তাওহিদের উপাদানগুলো বিপরীত কিছুর উপস্থিতিকে সহ্য করে না। কারণ যদি যৌক্তিকভাবে এই বিপরীত উপস্থিতিকে সম্ভবও ধরা হয়, তথাপি কোন মুসলিম অন্তরে কখনো দুটি একত্রিত হতে পারে না। অন্যথায় এটা হবে কাররামিয়াদের মাযহাব। যারা বলে অন্তরে আল্লাহর পরিচয় স্থির হয়ে যাওয়ার পর তার সাথে যেকোন কুফরী আমলও হতে পারে।

প্রসিদ্ধ কথা হল, কুফরের প্রকাশ্য আমলগুলোই তার অভ্যন্তরের কুফরীকে প্রমাণ করবে। কারণ উভয়টির মাঝে আবশ্যকীয় যোগসূত্র রয়েছে। তবে শুধু গুনাহের বিষয়টি এমন নয়। সুতরাং শরয়ীভাবে কুফরী আমল স্বয়ং শরীয়ত

প্রণেতার পক্ষ থেকে আমলকারীর অন্তরের বিষয়ে সাক্ষ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো হাসি-তামাশা ও ফূর্তি করছিলাম। বল, তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তার রাসূলকে নিয়ে ফূর্তি করছিলে? অজুহাত দেখিও না। তোমরা ঈমান প্রকাশ করার পর কুফরীতে লিপ্ত হয়েছ।"

সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাদের প্রকাশ্য কুফরের ভিত্তিতেই তাদের অভ্যন্তীণ কুফরের কথা বললেন। যেমনটা অনেকে বলে থাকে, প্রকাশ্য অবস্থা অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিরোধী হওয়ার সম্ভাবনার কথা[২] এখানে গ্রাহ্য করা হয়নি।

[২] যেমন অনেকেই স্পষ্ট কুফর এবং/অথবা শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে বলে – সে অমুক অমুক আমলে লিপ্ত হলে কী হবে, তার অন্তরে তো ইমান আছে!

৩. ইসলাম ও কুফরের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যক্তি ও শাসকদের মাঝে পার্থক্য:

এটা এমনিতেই স্পষ্ট যে, এটা শুধু দল বা গ্রুপের ‘হুকুম’ এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেহেতু ‘হুক্ম’ (حكم) শব্দটি দু’টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ‘কাজ বাস্তবায়ন করা’ ও ‘বিধান প্রণয়ন করা’। ‘হুকুম’ আল্লাহর দিকে ফিরানোর ব্যাপারে কুরআনের যে সকল আয়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হল বিধান প্রণয়নের কাজকে আল্লাহর দায়িত্বে ন্যস্ত করা। আর কেবল এমন কোন দলের পক্ষেই বিধান প্রণয়ন তো করা সম্ভব, যারা আল্লাহর বিধানব্যবস্থার সমকক্ষ হিসাবে ভিন্ন কোন বিধানব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য করে।

তো শরীয়তবিরোধী কোন আমলকে কাজে বাস্তবায়ন করা- যেমন জুলুম করা, সম্পদ ছিনতাই করা বা এজাতীয় কাজগুলো করা- কিন্তু বিধি-বিধানের মূল উৎস হিসাবে শরীয়তকেই বহাল রাখা, এটা শরীয়ত থেকে পলায়ন নয়। খেলাফত পতনের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী শাসনের অধিকাংশ যুগেই যেমনটা ছিল। তারপর এক সময় শাসনব্যবস্থা এমন আইন-কানুনে রূপ নিল, যাতে মানব রচিত আইন-কানুনেরও মিশ্রণ ঘটল। তারপর এক পর্যায়ে মানব রচিত আইন-কানুনই বিধান রচনার একমাত্র উৎস হিসাবে অবশিষ্ট রইল। তারা আল্লাহর শরীয়তের সাথে মানুষের আইন-কানুন এবং নিজেদের মস্তিস্ক প্রসূত বিধি-বিধানকে যুক্ত করল। হুবহু ইহুদীরা পূর্বে যেমনটা করেছিল।

আর একক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করার সাথে সম্পর্কিত। যদি সে শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে বা শরয়ী কোন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে, তা কবুল না করে, তবে সেটা নিরেট কুফর। ব্যক্তির উপর হুকুম আরোপ করা যাবে, যখন সে শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করবে। একারণে তার থেকে তাওবাও চাইতে হবে। এর সাথে শর্ত হল তার মধ্যে পূর্ণ যোগ্যতা

বা সামর্থ্য থাকতে হবে। অর্থাৎ শরীয়ত প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তার মধ্যে কোন বলপ্রয়োগ, অজ্ঞতা বা ভুলে যাওয়ার গ্রহণযোগ্য ওযর অনুপস্থিত হতে হবে। আর শাসকের বিষয়ে যদি আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেই, তাহলে দেখতে পাই যে, তার ব্যাপারে দুই ধরণের কিয়াস হতে পারে:

> এক. সাধারণ একজন মুসলিম সদস্যের ন্যায়। সুতরাং তার দ্বীন শুদ্ধ হওয়ার ফায়সালা সম্পর্ক রাখবে, সকল ফরজে আইনগুলো পালন করা, এমন কোন নিশ্চিত কুফরী বিষয়ে লিপ্ত না হওয়া, যার উপর আহলুস সুন্নাহর সকল উলামাগণ একমত হয়েছেন এবং তার মধ্যে তাকফীরের প্রতিবন্ধক কোন বিষয় পাওয়া না যাওয়ার সাথে। যেমন অজ্ঞতা (যেখানে এটা গ্রহণযোগ্য) এবং ভুল করা। যেমন اللهم أنت عبدي وأنا ربك এই হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে[৩]। আর তার ওপর বলপ্রয়োগ বা অনন্যোপায় হয়ে কোন কাজ করার ব্যাপারে ভিন্ন হাদিস রয়েছে, যা পরিশিষ্টে আসবে।
>
> দ্বিতীয় কিয়াস হল: সে এমন একটি সংগঠনের প্রধান, যা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত ভিন্ন বিধান দিয়ে শাসন করে। এখানে হুকুম বা শাসন করার অর্থ হল আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বাইরে ভিন্ন বিধান প্রণয়ন করা। শরীয়তকেই আইনের একমাত্র উৎস হিসাবে বহাল রেখে শুধু দু-এক ক্ষেত্রে শরীয়ত বিরোধী কাজ বাস্তবায়ন করার কথা এখানে বোঝানো হচ্ছে না। শুধু শরীয়তবিরোধী কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে জুলুম, অবাধ্যতা, ফাসেকি। কিন্তু শরীয়তকে গ্রহণ করার দাবি করা, তারপর সেটাকে এক পাশে রেখে দেওয়া এবং সকল মানুষের সাথে মিলে মিশে নিকৃষ্ট বিধান আবিস্কার করে সেটাকে শরিয়তের সমান বা তার চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ে রাখা, এটা পরিপূর্ণ কুফর। সূরা মায়িদার আয়াতে ও অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই কুফরের কথাই উদ্দেশ্য করেছেন।

---

[৩] একজন সাহাবি ভুলবশত বলেছিলেন, "হে আল্লাহ আমি তোমার রব"

আমরা এর একটি উদাহরণ পেশ করছি:

> দু’জন বিচারক। প্রথমজনের নিকট একজন মাতাল লোক এসেছে। বিচারক চাইল, কোন একটা উসিলার মাধ্যমে তাকে হদ (শাস্তি) থেকে নিস্কৃতি দিতে। তাই সে এই রায়ে লিখলো, তার রক্তের মধ্যে কোন এলকোহল নেই। যদি তাতে এলকোহল থাকার কথা লেখা হত, তাহলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হত। কারণ তার শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হল শরীয়ত।
>
> দ্বিতীয় বিচারকের কাছেও একজন মাতাল লোক আসল। তার নিকটও এমন একটি উসিলা আসল। কিন্তু বিচারক সেটা গ্রহণ করলো না। তাই তার নিকট এই ফলাফল আসল যে, লোকটির রক্তের মধ্যে এলকোহল প্রবল, যা তার নেশাগ্রস্থ হওয়া প্রমাণ করে। ফলে বিচারক মানব রচিত শাসনব্যবস্থার আলোকে লোকটির উপর শাস্তি কার্যকর করল। আর সে শাস্তিটা হল কিছু দিন জেলখানায় রাখা এবং আর্থিক জরিমানা ধার্য করা।

এক্ষেত্রে প্রথম বিচারক গুনাহগার, জালিম ও অবাধ্য। আর দ্বিতীয় বিচারক কাফের, ধর্ম থেকে বহিস্কৃত।

এ ব্যাপারে এর চেয়ে স্পষ্ট কোন উদাহরণ হয় না।

এখানে শাসক একটি শাসনব্যবস্থার প্রধান। সে তার আইনগুলো কার্যকর করে, অব্যাহতভাবে এই আইনের সমর্থন ও সাহায্যকারী। এখন যদি শাসনব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র হয়, তাহলে এই শাসনব্যবস্থা কুরআন সুন্নাহকে উৎস হিসাবে গ্রহণ করবে না অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রহণ করবে, আর কিছুর ক্ষেত্রে মানবরচিত আইন-কানুনকে উৎস হিসাবে গ্রহণ করবে। তাই এমন শাসক এমন কুফরীর আস্তানায় আছে, যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সে তার শাহাদাহকে ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে। তার থেকে এমন প্রকাশ্য বিষয় পাওয়া গেছে, যা পূর্বের প্রকাশ্য বিষয়কে, অর্থাৎ তার শাহাদাতের সাক্ষ্যকে অকার্যকর করে দিয়েছে।

কখনো কেউ বলতে পারে, সে তো নিজে আইন প্রণয়ন করেনি, বরং সে এসে এগুলো পেয়েছে, তাই এগুলোর দ্বারা শাসন করছে। আমরা বলবো:

> **এক মুহূর্তের জন্যও কুফরকে শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ও উৎস হিসাবে বহাল রাখা জায়েয নেই। তার উপর আব্যশ্যক হল, শাসনকর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসূলের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া এবং শাসনব্যবস্থায় শরীয়তকেই চূড়ান্ত উৎস ও ভিত্তি হিসাবে ঘোষণা দেওয়া।**

তারপর চলমান শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরীভাবে পরিবর্তন করার কাজ পর্যায়ক্রমে করা যাবে। কোন বিধানটি কতটা গভীরতা লাভ করেছে সে হিসাবে এবং এমন ভারসাম্য রক্ষা করে করা যাবে, যা মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করা। বিভিন্নমুখী স্বার্থের পারস্পরিক সংঘর্ষ ও বিভিন্ন প্রকার মুদ্রাব্যবস্থা চালু থাকার কারণে এটি একটি দীর্ঘ লড়াইয়ের বিষয়। এটি একটি গবেষণার বিষয় এবং দেশের 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' কমিটির দিকনির্দেশনার বিষয়, যার সাথে গণতন্ত্রের দূরতম সাদৃশ্যও নেই[৪]।

---

[4] গণতন্ত্র এমন একটি শব্দ, যার উৎপত্তিগত অর্থ হল: জনগণের উপর জনগণের শাসন। আমি এর সাথে আরো যোগ করি যে, এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিরল একটি আদর্শ হল: প্রতিনিধি নির্বাচনে সকল সদস্যদের ভোটের মূল্য সমান হওয়া। এর অর্থ হল, দেশের প্রতিটি জনগণেরই তাদের আইন-কানুন নির্ধারণ করার অধিকার আছে। আর তা বাস্তবায়িত হবে সাংবিধানিক সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী। এটাই সত্য, সঠিক ও অনুসরণীয় আইন হিসাবে বিবেচিত হবে।

অত:পর এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাস্তবে প্রতিফলিত হবে ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যদের সংখ্যা দ্বারা। একারণে স্বাভাবিকভাবেই গণতন্ত্রের সেবকরা প্রচার করে থাকে যে: গণতন্ত্র নারী-পুরুষ, সাদা-কালো, ধনী-গরীব, সর্বমান্য-নগন্য সকলকে সমান মনে করে। কিন্তু আমরা এখানে আরো যোগ করি যে, এমনিভাবে ইতর-ভদ্র, আল্লাহভীরু-যিনাকারী, মুসলিম-খৃষ্টান-বৌদ্ধ, নির্দোষ-চোর সকলকে সমান মনে করে। এমনকি সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, শিক্ষিত-মূর্খকেও সমান

গণ্য করে। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান। মানব-জীবনের সকল বিষয়ে আইন-কানুন রচনায় কে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে তা নির্বাচনে সকলেরই এক সমান অধিকার।

উপরোল্লেখিত সকল শ্রেণীর মাঝে সমতা সৃষ্টি করার কারণে আমাদের অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ ও দায়ীগণ গণতন্ত্র আর ইসলামের শুরাকে এক বলতে খুব মজা পান। এছাড়া যেহেতু গণতন্ত্র এই দিক থেকেও সকলের মাঝে সমতা সৃষ্টি করে যে, কারো উপর কারো কোন প্রভাব থাকবে না। তারা এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাযিয়াল্লাহু আনহু এদের ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন দু'একটি ঘটনার মাধ্যমে দলিল পেশ করে।

এতে স্বভাবতই বর্ণনাসমূহের ভুল প্রয়োগ হয়, মূর্খ ব্যাখ্যাকারীদের মত অপব্যাখ্যা করা হয় এবং নিজেদের কাঙ্খিত ফলাফলে পৌঁছার জন্য ঘটনাগুলোকে অনুপযুক্ত স্থানে রাখা হয়। আর সেই কাঙ্খিত লক্ষটি হল, পশ্চিমাদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করা।

গণতন্ত্র শুরার সম্পূর্ণ বিপরীত। এর ব্যাখ্যা নিচে দেয়া হল:

শুরা হল সমাজের এমন একদল লোকের একত্রিত হওয়া, যারা ইলম ও চরিত্রের দিক থেকে সর্বোচ্চ বাছাইকৃত। যারা আমাদের ইতিহাসে আহলুল হাল্ল ওয়ালকদ নামে পরিচিত। তাদের উন্নত গুণাবলী এমন পরিচিত ও জানাশোনা থাকবে যে, তাদের গুণাবলীই ফায়সালা করে দিবে যে, তারা শরীয়তের আলেম, সৃষ্টিজীবের মধ্যে সর্বোচ্চ তাকওয়াবান, ভেতর-বাহিরে পবিত্রতার অধিকারী। আর সমাজের এই বাছাইকৃত দলটির নির্বাচনের ভিত্তি হবে পরিশুদ্ধতা। আর পরিশুদ্ধতার ভিত্তি হবে ইলম ও শরয়ী চরিত্র। যার স্বীকৃতি দিবে শরয়ী কার্যাবলীর জন্য নিযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন কোম্পানী, সেনাবাহিনী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা অর্থমন্ত্রণালয় নয় এবং এক্ষেত্রে মেশিনারী বিশ্লেষণের কোন সুযোগ নেই।

আর এই বাছাইকৃত দলটিই তাদের মাঝে পরামর্শ করে নেতা নির্বাচন করবে। তারা জীবনের যেকোন বিষয়ে বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য গ্রহণ করবে। দুই প্রকারের সাহায্য: ১. পরামর্শের সাহায্য। ২. নির্বাহী সাহায্য।

সকল প্রকার সংশয়-সন্দেহ দূর করার স্বার্থে উভয় প্রকারের মাঝে মিশ্রণ ঘটানো যাবে না। 'আহলুলহাল্ল ওয়াল-আকদ' হল নেতা বা খলীফার পরামর্শদাতা। আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো হল 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ'র পরামর্শদাতা।

নির্বাহি ক্ষমতা পুরোটাই রাষ্ট্রপ্রদান বা খেলাফতের হাতে থাকবে। সুতরাং শুরা ব্যবস্থার ধারণায় যে বিভিন্নমুখী ক্ষমতা, এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলিত ক্ষমতার তিন শাখার মত

৪. আমাদের মুসলিম প্রাচ্যে যে সমস্ত দেশকে ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা শাসন করছে, সেগুলোর হুকুম:

এটি ফিকহের কিতাবসমূহের একটি অকাট্য বিষয়। যার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন দ্বিমত নেই। যেহেতু ইমাম চতুষ্টয় এ শর্তের উপর একমত হয়েছেন যে, দেশ পরিচালনাকারী শাসনব্যবস্থা হতে হবে ইসলামী শাসনব্যবস্থা। ইমাম

নয়। বিচারব্যবস্থা আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের ক্ষমতাধীন থাকবে। এটা কখনোই নির্বাহি প্রতিষ্ঠানের আজ্ঞাবহ হবে না।

আমরা যদি এই চিন্তায় আসতে পারি, তাহলে আমরা দেখি যে, গণতন্ত্র ও শুরার মাঝে চিন্তাগত ও আকিদাগত দিক থেকে এবং উপায় ও উপাদান হিসাবে ব্যাপক ও সুস্পষ্ট পার্থক্য।

১.গণতন্ত্রের কোন অবিচল নীতিমালা ও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠরা যা বলে তা-ই। অথচ শুরা কিতাব-সুন্নাহ, প্রমাণিত শরয়ী দলিল এবং সেই বিশুদ্ধ ইজতিহাদ দ্বারা সাব্যস্ত দলিলের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যাতে শরয়ী সুস্পষ্ট বর্ণনাকে উপেক্ষা করা হয়নি।

২.গণতন্ত্র এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অন্য যেকোন উৎস তার সাথে সাংঘর্ষিক হোক না কেন। পক্ষান্তরে শুরার মাঝে একথা পরিস্কার থাকে যে, শাসনকর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্য কারো জন্য নয়। ما يحكم والأمر الخلق له ألا ,يريد

৩.গণতন্ত্র দেশের সকল সদস্যদের সমমানের ভোটাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন ভিত্তিতেই কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। আর শুরার ভিত্তি হল প্রত্যয়নের মাধ্যমে একটি সংগঠন তৈরী করা, যাদেরকে যাচাই করবে দেশের উলামায়ে কেরাম এবং ইলমী ও শরয়ী মর্যাদাসম্পন্ন ও নেতৃত্বশীল লোকেরা।

তাই শুরাকে গণতন্ত্রের সাথে মিলানো মারাত্মক ভুল। ফিকহী বুঝ না থাকার আলামত।

আবু হানিফা রহ. আসলেন (কোন ভূখন্ড দারুল হারব হবার)আরো দু’টি শর্ত যুক্ত করেছেন। সে দু’টি হল:

১. দেশটি কুফরী রাষ্ট্রের প্রতিবেশী হওয়া।

২. পূর্বের নিরাপত্তা বহাল না থাকা।

অতঃপর সর্বাধিক জটিলতাপূর্ণ একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। আর এমতবস্থায় আল্লাহ তা’আলা শাইখুল ইসলাম, আলামুল আ’লাম ইবনু তাইমিয়্যাহকে রহ. নিযুক্ত করলেন এর প্রতিটি হরফের উপর নুকতা স্থাপন করার জন্য। যেটা ফাতওয়া মারিদিনিয়্যাহ হিসাবে প্রসিদ্ধ। তার বিস্তারিত বর্ণনা এরকম ছিল:

> শায়খ রহ.কে মারিদিন অঞ্চল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তা কি দারুল হারব নাকি দারুল ইসলাম? এবং সেখানে বসবাসকারী মুসলিমদের সেখান থেকে অন্য কোন মুসলিম দেশে হিজরত করা ওয়াজিব কি না? যদি হিজরত ওয়াজিব হয়ে থাকে, আর তথাপি হিজরত না করে নিজের জানমাল দিয়ে মুসলিমদের শত্রুদেরকে শক্তি যোগায়, সে কি এক্ষেত্রে গুনাহগার হবে কি না? যে তাকে মুনাফিক বলে বা এ কারণে তাকে গালি গালাজ করে, সে গুনাহগার হবে কি না?

তিনি তার উত্তর দেন:

> “আলহামদু লিল্লাহ। মুসলমানদের রক্ত ও সম্পদ সর্বদাই সম্মানিত ও হারাম, চাই তারা যেখানেই থাকুক না কেন। মারিদিনে থাকুক বা অন্য কোথাও থাকুক।
>
> ইসলামী শরীয়ত থেকে যারা বের হয়ে গেছে, তাদেরকে সাহায্য করা হারাম। চাই তারা মারিদিনবাসী হোক বা অন্য এলাকার অধিবাসী হোক।

সেখানে বসবাসকারীরা যদি সেখানে পরিপূর্ণ দ্বীন মানতে অক্ষম হয়, তাহলে তাদের উপর হিজরত করা আবশ্যক। অন্যথায় মুস্তাহাব হবে। ফরজ হবে না।

আর নিজেদের জানামাল দিয়ে মুসলিমদের শত্রুদেরকে সাহায্য করা তাদের উপর হারাম। তাদের যেকোন উপায়ে এর থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক। চাই আত্মগোপন করে হোক, কৌশলপূর্ণ কথা বলে হোক বা লৌকিকতা করে হোক। আর যদি হিজরত করা ব্যতিত কোনভাবেই এর থেকে বিরত থাকা সম্ভব না হয়, তাহলে হিজরত করা ফরজে আইন।

তাদেরকে ব্যাপকভাবে গালি দেওয়া ও মুনাফিক বলে অভিযোগ করা হালাল হবে না। বরং কিতাব-সুন্নায় উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকেই মুনাফিকির অভিযোগ করা বা ভর্ৎসনা করা যাবে। ফলে এতে কতিপয় মারিদিনবাসী যেমন অন্তর্ভূক্ত হবে, তেমনি অন্যান্য এলাকার অধিবাসীরাও হবে।

আর এটা দারুল হরব নাকি দারুল ইসলাম - এটি একটি মিশ্র এলাকা। এর মধ্যে উভয় অর্থই পাওয়া যায়। এটা সেই দারুল ইসলামের পর্যায়ে নয়, যেখানে ইসলামী বিধি-বিধান জারি হয়। আবার সেই দারুল হারবের পর্যায়েও নয়, যার অধিবাসীরা কাফের। বরং এটা তৃতীয় একটা প্রকার। এখানে মুসলিমদের সাথে তাদের উপযুক্ত আচরণ করতে হবে এবং যারা ইসলামী শরীয়ত থেকে বের হয়ে গেছে, তাদের সাথেও তাদের উপযুক্ত আচরণ করতে হবে।”(মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড:২৮, পৃষ্ঠা:২৪০, দারু আলামিল কুতুব প্রকাশনী।)

২০১০ সালে তুর্কিরা তাদের দেশে একটি সম্মেলন করে এই ফাতওয়াটির পর্যালোচনার করার চেষ্টা করে। তাতে সরকারের অনুগত একদল মুনাফিক - যেমন ইবনে বিহ ও তারিরি- উক্ত ফাতওয়াটির অর্থ ও উদ্দেশ্যকে বিকৃত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কারণ ফাতওয়াটি এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, তাতে ঐ

দেশের কথাই বলা হয়েছে, যাতে আল্লাহর শরীয়ত ব্যতিত ভিন্ন আইন দিয়ে শাসন করা হয় আর তার জনগণ মুসলিম।

ইবনে তাইমিয়া মারদিনের ব্যাপারে যেমনটা বলেছেন, সেটা ছিল একটি মিশ্র দেশ- আমি মনে করি, সেটা বর্তমানে মুরতাদ শাসকদের দ্বারা পরিচালিত আমাদের দেশগুলোর অবস্থার সবচেয়ে কাছাকাছি।

৫. ইকরাহ বা বলপ্রয়োগের দাবি করে কুফরী আমল গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

এ বিষয়ে আমরা পূর্বে একটি পূর্ণ গবেষণা পেশ করেছি। তাতে একজন তালিবুল ইলমের একটি পর্যালোচনার খণ্ডন ছিল। সে একথা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, বলপ্রয়োগের অবস্থায় কুফরী আমলকারীকে ওযরগ্রস্থ বলে গণ্য করা হবে। যেহেতু সে বলপ্রয়োগের রূপটিকে অনন্যোপায় অবস্থার দিকে নিয়ে গেছে। যদিও সে প্রথমে উভয়টির মাঝে পার্থক্য করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। তারপর সে এই মূলনীতি প্রয়োগ করেছে যে, الضرورة تبيح المحظورات(قولا و عملا!) “অনন্যোপায় অবস্থা নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ করে দেয়” (তা কথা হোক বা কাজ হোক!) তার পর্যালোচনার অধিকাংশ বিষয়বস্তুগুলো আমি সামনেই তুলে ধরছি, যাতে আমাদের আলোচনাটি এখানে পূর্ণ হয়ে যায়[৫], পাঠককে অন্য কোন স্থানে দৌঁড়াতে না হয়।

---

[5] স্বল্পকাল পূর্বে শামের ঘটনাবলীর বিষয়ে কিছু কিছু যুক্তিবাদীদের মাঝে الضرورة (‘আদ-দারুরাহ’) বা ‘অনন্যোপায় অবস্থা’কথাটি ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তারা সংশয় ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের কিছু রাজনৈতিক ইজতিহাদের উপর এই মূলনীতিটি প্রয়োগ করতে চায়। আমি আমার কিতাব “আলজাওয়াবুল মুফিদ ফি হুকমি জাহিলিত তাওহিদ”এর টিকায় এই পর্বগুলো লিখেছিলাম। যা ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

الضرورة হল সেই তিন স্তরের এক স্তর, শরীয়তের পাঁচো প্রকার বিধি-বিধান যার অধীনে চলে আসে। উক্ত তিন স্তর হল: ১. الضرورة(আদ-দারুরা) বা অনন্যোপায় অবস্থা, ২. الحاجة (আল-হাজাহ) বা প্রয়োজন, ৩. التحسين (আত-তাহসীন) বা

সৌন্দর্য সৃষ্টি করা। প্রত্যেকটিরই রয়েছে শরয়ী সংজ্ঞা। তবে অনেক সময়ই এগুলোর মাঝে হযবরল লেগে যায়। বিশেষত: الضرورة ও الحاجة এর মাঝে। যেহেতু ব্যবহারিক দিক থেকে অনেক সময় শব্দদু'টি সমার্থক হয়। এছাড়া যেহেতু الضرورةএর বিধানগুলো ব্যক্তি ও জামাত হিসাবে তারতম্য হয়। এর বিস্তারিত আলোচনার স্থান ইলমুল উসূল।

الضرورة এর দু'টি রূপ: হয়ত কোন মানুষের ইচ্ছাকৃত কাজের কারণে হবে। অথবা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগত কোন কারণে হবে। মানবসৃষ্ট الضرورة এর সবচেয়ে বড় রূপ হল বলপ্রয়োগ। এজন্যই আমরা এক্ষেত্রে এ বিষয়টির উপরই গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আর আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগত কারণের উদাহরণ হল, যেমন এক ব্যক্তি ভয়ংকর আগুন থেকে বাঁচার জন্য উলঙ্গ অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল। এই ব্যক্তি উলঙ্গ অবস্থায় বের হতে বাধ্য ছিল। অথবা যেমন কুল-কিনারাহীন মরুভূমিতে শুকর খাওয়া বা মদ পান করা। এ সমস্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কারো কোন বিতর্ক নেই। আমি নিচে সেই টিকাটি তুলে ধরবো। যেন আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক পরিপূর্ণ একটি আলোচনা প্রকাশ করে দেন।

أكراه বা বলপ্রয়োগ প্রসঙ্গটির গুরুত্ব বিবেচনায় আমাদের কাছে ভাল মনে হচ্ছে, নিচে সংক্ষেপে তার শরয়ী অর্থ ও তার কার্যকরীতার সীমা বর্ণনা করে দেই।

أكراه এর সংজ্ঞা: একজন আরেকজনকে এমন কাজ করতে বাধ্য করা, যা সে করতে রাজি না এবং তাকে নিজ ইচ্ছার সাথে ছেড়ে দেওয়া হলে সে তা করত না। এর দ্বারাই أكراه ও ضرورة এর মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। তা হল, ইকরাহ অবস্থায় বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি কোন কাজ করতে বাধ্য করে। পক্ষান্তরে দারুরাহ'র অবস্থায় একজন লোক এমন অনন্যোপায় অবস্থায় থাকে যে, তার জন্য হারাম কাজটি করা অবধারিত হয়ে যায়। এতে কোন মানুষের হস্তক্ষেপ থাকে না।

ইকরাহ এর প্রকারসমূহ:

ইকরাহ দুই প্রকার:

(ক) নিরুপায়কারী ইকরাহ। তা হল, যার মধ্যে সন্তুষ্টি থাকে না এবং কর্মের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং তাতে বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি সম্মত থাকে না এবং তার ভিন্ন কিছু করার স্বাধীনতা থাকে না।

(খ) অসম্পূর্ণ ইকরাহ। তা হল, যার মধ্যে সন্তুষ্টি থাকে না, তবে কর্মের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। নিরুপায়কারী ইকরাহ তথা পরিপূর্ণ ইকরাহই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ইকরাহ এর সীমারেখা: যার কারণে প্রাণনাশের বা অঙ্গহানীর আশঙ্কা থাকে অথবা এমন মারাত্মক নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, যার কারণে এ দু'টির কোন একটি হয়। এ হল যখন ধমকিটা সরাসরি বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে প্রদান করা হয়। কিন্তু যদি অন্য কাউকে লক্ষ্য করে বলা হয়, তাহলে এর ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে।

যখন নিজের আত্মীয়-স্বজনের বাইরে কাউকে লক্ষ্য করে ধমকি প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে মালিকী ফকীহগণ ও কিছু কিছু হানাফী ফকীহের মত হল সে মুকরাহ নয় (বলপ্রয়োগকৃত নয়)। আর অন্য কিছু সংখ্যক হানাফী ফকীহ মনে করেন, এটা একটি ইকরাহ।

যখন নিজের পিতা বা পুত্রকে লক্ষ্য করে ধমকিটি প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে হাম্বলী, শাফেয়ী ও কিছু সংখ্যক হানাফী ফকীহ মনে করেন এটা ইকরাহ।

যদি ধমকিটি সম্পদ ধ্বংস করার ব্যাপারে হয়, সেক্ষেত্রে ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমাদ রা.এর মতে সম্পদ বেশি হলে, ইকরাহ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু হানাফীদের মতে এটা ইকরাহ নয়। কেননা তাদের নিকট ইকরাহ এর ক্ষেত্র হল ব্যক্তি, সম্পদ নয়।

ইকরাহ এর শর্তাবলী:

- নগদ বিষয়ের উপর ধমকি হতে হবে। অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে যাবে। আর যদি এমন বিষয়ের ব্যাপারে ধমকি হয়, যা বিলম্বে ঘটবে, তাহলে এটা ইকরাহ হবে না। কেননা সেক্ষেত্রে মুকরাহ এর বিপদ দূর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।
- মুকরিহ স্বীয় ধমকি কার্যকর করতে সক্ষম হতে হবে। যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আদেশ বা শাসিতের প্রতি শাসকের আদেশ। যদি জানা যায় যে, শাসকের বিরোধিতা করলে মৃত্যু অনিবার্য।
- মুকরাহ এর এ ব্যাপারে প্রবল ধারণা হতে হবে যে, যে কাজের জন্য তাকে বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে সে কাজটি সে না করলে এক্ষুণি তার উপর শাস্তি নেমে আসবে। হাম্বলী মাযহাবের কেউ কেউ ইকরাহ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কিছু শাস্তি শুরু হয়ে যাওয়াকে শর্ত করেছেন। অন্যথায় তাদের মতে তা ইকরাহ বলে ধর্তব্য হবে না।

ইকরাহ এর কারণে যা যা বৈধ হয়:

এর কারণে প্রত্যেক হারাম কাজ বৈধ হয়ে যায়। যেমন মৃত প্রাণী ভক্ষণ করা, মদ পান করা, অন্তরে ঈমান স্থির রেখে মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করা ইত্যাদি। যদি "নিরুপায়কারী ইকরাহ"র উপাদানগুলো পাওয়া যায়, তাহলে এটা উচ্চারণের কারণে

তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে না। আর যদি "নিরুপায়কারী ইকরাহ'র উপাদানগুলো পাওয়া না যায়, তাহলে বাহ্যত তার উপর কুফরের হুকুম আরোপ করা হবে। এমনকি সে ইকরাহের দাবি করলেও। কারণ কুফরী কালিমা উচ্চারণ করাকে মৌলিকভাবে কুফরী কাজ ধরা হয়। তার থেকে শুধু ঐ ব্যক্তির হুকুমই ব্যতিক্রম ধরা হবে, যার উপর কার্যগতভাবে নিরুপায়কারী ইকরাহ বাস্তবায়িত হয়। যদি এরূপ ইকরাহ সাব্যস্ত না হয়, তাহলে কাজটি তার মূল হুকুম ও মূল ফলাফলের দিকে ফিরে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

مَن كَفَرَ بِاللَّـهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّـهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত। (নাহল, ১০৬)

ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেন: যে কুফরী কালিমা উচ্চারণ করবে সে কাফের হয়ে যাবে। একমাত্র সে-ই এর ব্যতিক্রম, যে বলপ্রয়োগের শিকার হয়, ফলে সে মুখে কুফরী কালিমা উচ্চারণ করে, কিন্তু তার অন্তর ঈমানে স্থির থাকে। (আসসারিমুল মাসলুল-৫২৪)

যে সমস্ত কাজ ইকরাহ বা দারুরাহ কোনটার কারণেই বৈধ হয় না:

- হত্যা বা এমন প্রহার, যা পরিণামে হত্যার পর্যন্ত পৌঁছায়। সর্বসম্মতিক্রমে এটা বৈধ হবে না।
- যিনা। মালিকী ও হানাবিলাদের মতানুযায়ী মুকরাহ ব্যক্তির জন্য যিনা করা বৈধ হবে না। আর শাফিয়ী ও হানাফীদের মতে বৈধ হবে।
- মালিক রহমাতুল্লাহে আলাইহি এর মতে শুধুমাত্র হত্যার হুমকি দেওয়া হলেই কুফরী কালিমা উচ্চারণ করা যাবে। অঙ্গ কর্তন বা এজাতীয় কোন হুমকি মালিকীদের মতে কুফরী কালিমা উচ্চারণের উপর ইকরাহ বলে ধর্তব্য হবে না।
- যেকোন কুফরের উপর ইকরাহ করার ক্ষেত্রে যবানের কথার মাধ্যমে আত্মরক্ষার পথ গ্রহণ করা যাবে। কাজের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করা যাবে না। কেননা আত্মরক্ষার জন্য শুধু গুনাহের কথা বলা জায়েয আছে; কুফরী কাজে অংশগ্রহণ করা আত্মরক্ষার কোন মাধ্যম নয়।

ইবনে কাসীর রহ. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: কাজের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করা যাবে না। আত্মরক্ষা গ্রহণ করা যাবে যবানের মাধ্যমে। তিনি এটা ইমাম আওফী, যাহ্‌হাক, আবুল আলিয়া, আবুশ শা'ছা ও রাবী ইবনে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহে আলাইহি যাহ্‌হাক রহমাতুল্লাহে আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন, যাহ্‌হাক রহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেন:

যাকে এমন কথা বলতে বাধ্য করা হয়, যাতে আল্লাহর অবাধ্যতা রয়েছে, ফলে সে নিজের জানের ভয়ে তা বলে, কিন্তু তার অন্তর ঈমানে স্থির থাকে, তার কোন গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আত্মরক্ষা করা যায় শুধু যবানের মাধ্যমে।

হাসান বসরী, আওযায়ী, সুহনুন এবং মুহাম্মদ ইবনুল হাসান থেকেও এটা বর্ণিত। এটা ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এরও মত।

ইমাম মালেক ও শাফিয়ী রহ. থেকে এমনটাও বর্ণিত আছে যে, কথা-কাজ উভয়টির মধ্যেই রুখসত কার্যকর হয়।

হতে পারে, এটা শুধু গুনাহের কার্যাবলীর সাথে খাস। কারণ গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া (উদাহরণত:) হত্যার শিকার হওয়া থেকে হালকা বিষয়। তবে শর্ত হল, অন্যকে হত্যা করা বা অন্যের সাথে যিনা করা ব্যতিত ভিন্ন কিছু হতে হবে, যেমনটা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

পক্ষান্তরে কুফরী কাজের ব্যাপারে এটা স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে, এটা তাদের কথার আওতাভূক্ত নয়। কারণ কুফরী কাজ ইকরাহের কারণে হালাল হতে পারে না। যেমনিভাবে বিভিন্ন মাযহাবভেদে কিছু কিছু আমল কখনো হালাল হয় না। সুতরাং উদাহরণত: কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র হুমকি প্রদানের কারণে নিজেকে মুকরাহ মনে করে মুসলিম রমণী ও মুসলিম যোদ্ধাদের তথ্য শত্রুদের নিকট বলে দিতে পারে না।

তবে হ্যাঁ, এ ধরণের পরিস্থিতিতে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় নেওয়া ও অবস্থার পরিমাপ করা জরুরী। কারণ উদাহরণত: এমন অবস্থাও হতে পারে যে, একজন মানুষ অমানুষিক নির্যাতনের এই পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যখন তার নিজস্ব ইচ্ছা-শক্তি পরিপূর্ণ খতম হয়ে যায়, ফলে সে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এবং তার মুখ থেকে কি বের হচ্ছে তার ব্যাপারে অনুভূতিশূন্য হয়ে যা শিখিয়ে দেওয়া হয়, তাই বলতে থাকে বা করতে থাকে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে কখনো ইকরাহ হিসাবে কুফরী কাজটাও রুখসতের অধীনে আসতে পারে।

যাই হোক, একথার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, ইকরাহের উপাদানসমূহ ও ফলাফলগুলোর পরিমাপ অবস্থাভেদে ও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পারে। আবার কখনো কোন কুফরী কথা বা কাজের মধ্যে "বৈধকারী ইকরাহ" সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কি না তা নির্ণয় করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী রহমাতুল্লাহে আলাইহি তো এই মত অবলম্বন করেছেন যে, কেউ প্রকাশ্যে শিরক করলে সে যদি মুকরাহও হয়, তথাপি প্রকাশ্যভাবে মুরতাদ সাব্যস্ত হবে। এমনকি যদি সে তার মাঝে আর আল্লাহর মাঝে মুসলিমও থাকে, তবু। তবে আমরা তার এই মতটিকে শরীয়তের দলিল সমর্থিত মনে করি না।

তবে শামের ঘটনাবলীর উপর নির্দিষ্ট কারণের আলোকে এসমস্ত বিধানগুলো প্রয়োগ করা বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। যদিও অনেকে দাবি করে, 'দারুরা' বিষয়টির সাথে তাদের কর্মকান্ডের সম্পর্ক আছে।

একটি প্রচারিত পর্যালোচনার ব্যাপারে কিছু কথা:

আমি জনৈক শরয়ী পর্যালোকের একটি পর্যালোচনা দেখেছি, যার শিরোনাম ছিল: "তাকফীরের মাসআলাসমূহে দারুরা বা অনন্যোপায় অবস্থার প্রভাব"।

সত্যকথা হল, লেখক তার আলোচনায় কি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তা আমি অনেক কষ্টের পর বুঝতে সক্ষম হয়েছি, যখন তিনি তার নির্ধারিত বিষয়টিকে মৌলিক সূত্র বলে প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন মাযহাবের উপর তার তারজীহ বর্ণনা করা পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। কারণ তার আলোচনাগুলো ছিল হযবরল। অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ লেখকগণ যেমন প্রথমে একটি ভূমিকা তৈরী করে তাতে নিজ উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করেন এবং নিজ উদ্দেশ্যকে সুদৃঢ় করে তুলেন, তা তার মধ্যে ছিল না। বরং শুধু তার আলোচনার বিভিন্ন অংশে যে বিষয়বস্তুগুলো আসছিল, সেগুলোকেই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর যে সূত্রটিকে তিনি মৌলিক সূত্র বলে উল্লেখ করেছেন তার ব্যাপারে একটি প্রশ্ন ছিল। অথচ তিনি যে সূত্র উল্লেখ করেছেন বা যে শিরোনাম সাজিয়েছেন তার কোনটিই আমি মৌলিক সূত্রসমূহের মধ্যে পাই নি। তাই আশা করি, আলোচক তার সামনের আলোচনাগুলোতে এ বিষয়টির ব্যাপারে সচেতন থাকবেন। কারণ প্রফেশনাল আলোচকদের এটি একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি। আর বাস্তবেও এটা উপকারী। এতে আলোচনার উদ্দেশ্য বুঝার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় না।

উক্ত আলোচক যে মাসআলাটির পর্যালোচনা করছিলেন তা তার বিভিন্ন স্তরসহ ইকরাহের অধ্যায়ের মধ্যে পড়ে। এটা ফিকহের অনেক অধ্যায়েই বিদ্যমান। এছাড়া ইলমুল উসূলে

ফরজ হওয়ার যোগ্যতার আলোচনায়ও এটা বিদ্যমান। পরিপূর্ণ যোগ্যতার ক্ষেত্রে হোক বা অসম্পূর্ণ যোগ্যতার ক্ষেত্রে হোক।

সত্যকথা হল, আমি দেখেছি, লেখক আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তার পেশকৃত দলিলগুলোকে তার উদ্দেশ্যিত বিষয়ের দিকে টেনে আনার। আর তার বিরোধী মতাবলম্বীদের মত খন্ডনে ছিল সুস্পষ্ট দুর্বলতা। তিনি যে খন্ডনই পেশ করেছেন, প্রত্যেকটিই তার নিজের বিরুদ্ধেই খন্ডন হয়ে যাচ্ছিল অথবা আলোচ্য বিষয়ের বাইরে চলে যাচ্ছিল। লেখক সর্বাত্মক চেষ্টা করেছন একথা প্রমাণ করতে যে, দারুরা, ইকরাহ থেকে ভিন্ন জিনিস। যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতালার নি¤চের আয়াতটিকে তার বিপক্ষের দলিল থেকে বের করে তার উদ্দেশ্যিত বিষয়ের উপর দলিল হিসাবে দাঁড় করাতে পারেন।

مَن كَفَرَ بِاللَّـهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّـهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত। (নাহল, ১০৬)

অথচ আয়াতটি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট যে, আয়াতের মধ্যে উদ্দেশ্য হল সর্বোচ্চ ‘নিরুপায়কারী ইকরাহ’। আর স্বাভাবিকভাবে, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ও সকল মানুষের ঐক্যমত্যেই এটা (‘নিরুপায়কারী ইকরাহ’) একটা অনন্যোপায় অবস্থা বা দারুরাহ। আরেকটি বিষয় হল, আয়াতের বক্তব্যটি কথা-কাজ উভয়টিকেই অন্তর্ভূক্ত করে। অথচ কুফরী কাজ বৈধ নয়। যা অপরিবর্তনীয় আকিদার একটি অংশ হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ এবং যা শরয়ী দলিলসমূহ ও উলামায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি কুফরী কাজ থেকে নিচের স্তরের অনেক কাজও বৈধ নয়। যেমন কাউকে অন্য কোন মুসলিমের প্রাণ হত্যা করতে বলপ্রয়োগ করা হল। এমনকি যিনার কাজের ব্যাপারেও বলপ্রয়োগ ধর্তব্য নয়। যিনার উপর বলপ্রয়োগ হতে পারে কি না এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরাম মতবিরোধ করেছেন।

তাই আয়াতে উদ্দেশ্য হল কুফরী কালিমা মুখে উচ্চারণ করা। সর্বসম্মতিক্রমে কুফরী কাজ উদ্দেশ্য নয়। যদিও আলোচক ভিন্নটা প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। দেখুন তিনি মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিসের মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এমন কথা মুখে বলতে অনুমতি

দিয়েছেন, যা তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কষ্ট দিবে। কিন্তু কষ্টদায়ক কোন কাজ করতে অনুমতি দেননি। অর্থাৎ কুফরী কথা শুধু মুখে বলার অনুমতি দিয়েছেন। তাহলে এখানে তার দলিল কোথায়? তিনি যদি এটা প্রমাণ করতে চাইতেন যে, এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকরাহ ব্যতিত শুধু ইসলামের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য কুফরী কথা উচ্চারণ করার অনুমতি দিয়েছেন, তাহলে এ ব্যাপারে বিতর্ক ছিল না। এ ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া বা অন্য কেউই দ্বিমত করেননি। যদিও উক্ত আলোচকের মনে ভিন্ন কিছু থাকুক না কেন। কিন্তু দলিলের দৌঁড় এর বাইরে যাবে না যে, ইকরাহ ও দারুরা সমার্থক জিনিস এবং উভয়টির ক্ষেত্রেই অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ থেকে শুধুমাত্র মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করা জায়েয হবে। কুফরী কাজ করা জায়েয হবে না।

কিন্তু আমি আলোচনার শেষ প্রান্তে পৌঁছার পূর্বেই বুঝতে পারলাম যে, আলোচনাটি একেবারেই মূল্যহীন। কারণ তিনি এমন একটি ফরজের দাবি করেছেন, যার কোন অস্তিত্বই নেই। উক্ত আলোচক তাকে ফরজ সাব্যস্ত করে তার উপর দলিল পেশ করতে থাকেন। এভাবে অদূরদর্শী পাঠকদেরকে প্রতারিত করেন। তাদের মাঝে এই সংশয় সৃষ্টি করেন যে, আলেমদের মতামতগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। একদল তাকফীরের মাসআলায় দারুরা এর প্রতি লক্ষ্য করেন। যেটার জন্য তিনি একটি শিরোনামও নির্ধারণ করেছেন। অত:পর সেটাকে মৌলিক সূত্র বলে গণ্য করেন।

আর আরেকদল তাকফীরের মাসআলায় দারুরার প্রতি লক্ষ্য করেন না। অত:পর ইমামদের বিভিন্ন উদ্ধৃতিগুলো দিয়ে দলিল দিতে থাকে। নিজ ইচ্ছামত যেকোন একটিকে নিয়ে তাদের একদলের দিকে সম্পৃক্ত করে। তারপর কথাবার্তায় পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ আরেকটি বক্তব্য নিয়ে দ্বিতীয় দলের সাথে লাগিয়ে দেয়। একারণেই আপনি দেখতে পারবেন যে, তিনি 'তাকফীরের মাসআলায় দারুরা লক্ষ্যণীয়' একথাকে প্রমাণিত করার জন্য নিজ দলিলগুলোর পক্ষে যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন তারা সংখ্যায় নগন্য এবং মর্যাদায় ঐ সমস্ত লোকদের থেকে নিচে যাদের মতামতগুলো বিপরীত দিকে উল্লেখ করেছেন। এমনকি তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য আবু বাসির আত-তারতূসী নামে পরিচিত বর্তমান যামানার জনৈক রুওয়াবিযার লেখারও দ্বারস্ত হয়েছেন। অথচ এই ধরণের লোকের লেখা থেকে কে দলিল গ্রহণ করে? যে নিজ গর্দান থেকে ইলমের লাগাম খুলে ফেলেছে?

এটা মারাত্মক ধোঁকা। চূড়ান্ত পর্যায়ের ধোঁকা। কারণ গবেষণার আলোচ্য বিষয়টিই বানোয়াট। এ বিষয়ে কোন দুই মত নেই। বরং আব্দুর রাজ্জাক আফিফী, আব্দুল্লাহ বিন বায, সুবকী ও অন্যান্য মাশায়েখগণ যা বুঝিয়েছেন, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কায়্যিম,

সুবকী ও অন্যান্য যাদের উদ্ধৃতি উক্ত গবেষক পেশ করেছে তারাও হুবহু একই কথা বুঝিয়েছেন। পার্থক্য শুধু শব্দের ভিন্নতা। এর চেয়ে বেশি নয়।

যে সমস্ত উদ্ধৃতিগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন, দেখুন সেগুলো:

"ইমাম সুবকী রহমাতুল্লাহে আলাইহি "আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের"র মধ্যে বলেছেন: এটা নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, কাফেরদের ধর্মীয় পোশাক পরিধান করা এবং কোন ইকরাহ ব্যতিত কুফরী কালিমা উচ্চারণ করা কুফর। তবে যদি এতে মুসলিমদের কল্যাণ থাকে এবং মুসলিমদের মধ্য থেকে কেউ এমনটা করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে যেটা আমার কাছে মনে হয়, এটা ইকরাহর মত হবে।"

এটাই তো হুবহু দারুরাহ। তাহলে দেখা গেল, সুবকী রহ. এর নিকট এটা বিবেচ্য।

ভাষাবিদ, ফকীহ, ইমাম ফিরোযাবাদী "বাসায়িরু যাওয়িত তাময়ীয" কিতাবে সূরা নাহলের অধিকাংশ আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে তার মধ্যে একটি উল্লেখ করেন: এবং ইকরাহ ও দারুরার সময় কুফরী কালিমা উচ্চারণ করার অনুমতি"।

তাহলে উপরোক্ত কথার কোনটিকে ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহে আলাইহি ও ঐ সকল ইমামগণ অস্বীকার করেন, যাদেরকে তিনি তার আবিস্কৃত গ্রুপদ্বয়ের এক গ্রুপের মধ্যে রেখেছেন?

প্রথমত: ইমাম সুবকী রহমাতুল্লাহে আলাইহি এর কথার উদ্দেশ্য হল, যদি এতে মুসলিমদের কল্যাণ থাকে এবং এর প্রতি তাদের তীব্র প্রয়োজন হয়, তাহলে এটা ইকরাহের মত হবে। একারণে এটা ইকরাহ এর হুকুম লাভ করবে। তাহলে তার নিকট এটা আর দারুরাহ সমান। যেহেতু তিনি 'সাদৃশ্য' অর্থ প্রদানকারীكاف تشبيه ব্যবহার করেছেন। কিন্তু উক্ত আলোচক এটাকে ইকরাহ থেকে ভিন্ন বিষয় সাব্যস্ত করে বলেন: "বরং এটাই হল দারুরাহ।"

প্রকৃতপক্ষে উভয়টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে যে নিজের বানানো প্রকারভেদকে আঁকড়ে ধরে থাকে তার নিকট ভিন্ন হতে পারে।

এমনিভাবে ফিরোযাবাদীর বক্তব্যও একই ধরণের। তিনি তো ইকরাহ, দারুরাহ ও 'নিরুপায়কারী ইকরাহ'কে একত্রিত করে ফেলেছেন। যেমনটা আমরা জেনেছি যে, নিরুপায়কারী ইকরাহ হল দারুরাহ'রই একটি রূপ। তাই মানতিকী দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হল আম-খাস উভয়টিকে উল্লেখ করে একটিকে আরেকটির উপর আৎফ করা, কোন তারতম্য করা ব্যতিত। যেন সে শুধু কুফরী কালিমা উচ্চারণ করেছে.. আর কিছু নয়।

কিন্তু এই আলোচক একথা প্রমাণে মরণপণ লেগে গেছেন যে, উভয়টার মাঝে মৌলিক পার্থক্য আছে। আর এর সমর্থন যোগায় একথা বলে যে, এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। তবে তার দুর্ভাগ্য হল, যাদেরকে তিনি প্রথম প্রকারের মধ্যে গণ্য করেছেন, তাদের কথাগুলোই সুদৃঢ় ও মজবুত। আর দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যে মতগুলো এসেছে সেগুলোর সর্বোচ্চ অবস্থা হল, সেগুলো তার কথার সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমনটা অনেক ইমামের কথার মধ্যে বিভিন্ন কারণে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়ে থাকে।

তারপর দেখুন, এই গবেষক নিজের স্থিরকৃত ফলাফলে পৌঁছার জন্য ধ্বংসের কত অতল গহ্বরে নেমেছেন! তা হল, একথা প্রমাণ করা যে, দারুরাহ এর ভিন্ন কিছু রূপও রয়েছে, যেগুলো ইকরাহের বিধি-বিধানের মধ্যে পড়ে না। সুতরাং সেগুলোর ব্যাপারে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ঘটনায় বর্ণিত ইবনুল কায়্যিম রহমাতুল্লাহে আলাইহি বক্তব্যের ব্যাখ্যায় তিনি যা বলেছেন, তা যথেষ্ট নয়। তাই তিনি বলে উঠলেন: এটা ফুকাহাদের নিকট প্রচলিত ইকরাহ নয়। বরং এটা দারুরা এর শ্রেণীভুক্ত একটি বিষয়। একারণেই এ মতের অধিকারীগণের মতে, যখন কঠিন প্রয়োজন দেখা দেয় এবং বিকল্পহীন অনন্যোপায় অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন কুফর জায়েয।

সুবহানাল্লাহ! এটা কতটা বিকৃতি ও বানোয়াট! একথা কি কেউ বলতে পারে যে, এ সকল ইমামগণ কোনও কারণে কুফরকে জায়েয মনে করেন?! এর রূপরেখা সীমাবদ্ধ করা হল না কেন?! তারা কি পরিপূর্ণ কুফরকে জায়েয মনে করেন?! তারা কি কথা-কাজ উভয়টার দ্বারা কুফরকে জায়েয মনে করেন? বা তারা কি অন্তরকে ঈমানের উপর অটল না রেখে শুধু কথার মাধ্যমেও কুফরকে জায়েয মনে করেন?! তার আবিস্কৃত প্রকারভেদের মধ্যে যারা তাকফীরের মাসআলায় দারুরাহকে বিবেচ্য মনে করেন, তাদের কথার মধ্যে এটা কোন জায়গায় আছে?! এমন কথা বলার দু:সাহস কে দেখাতে পারে?! আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তার রহমত হতে বঞ্চিত হওয়া থেকে।

দেখুন উক্ত গবেষক কর্তৃক উলামাদের কথাগুলোকে মিথ্যা ভাগে বিভক্ত করার অপচেষ্টার নমুনা! ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কায়্যিম রহ. উলামায়ে কেরামের যে ইজমা বর্ণনা করেছেন যে- কুফরী কালিমা উচ্চারণ করা ইকরাহের অবস্থা ব্যতিত কখনো জায়েয নেই- তাকে খন্ডন করে তিনি ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্যটি এভাবে উদ্ধৃত্য করেন: ইবনে তাইমিয়া বলেছেন: "মুসলমানদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই যে, কোনও উদ্দেশ্যে কুফরী কালিমা উচ্চারণ করার আদেশ করা বা অনুমতি দেওয়া জায়েয নেই। বরং যে তা উচ্চারণ করবে সে কাফের। তবে যদি বলপ্রয়োগের শিকার হওয়ার কারণে মুখে কুফরী কালিমা উচ্চারণ করে, কিন্তু অন্তর ঈমানের উপর স্থির থাকে, তাহলে এতটুকুর অনুমতি আছে।"

ইবনুল কায়্যিম বলেছেন:“উম্মতের মাঝে এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই যে, কোনও উদ্দেশ্যে কুফরী কালিমা উচ্চারণ করার অনুমতি দেওয়া জায়েয নেই। তবে বলপ্রয়োগের শিকার ব্যক্তি যদি অন্তর ঈমানের উপর স্থির রেখে মুখে কুফরী কালিমা উচ্চারণ করে, তবে এতটুকুর অনুমতি আছে।” কে বলবে যে, ইবনে তাইমিয়া রহ.এর এই উদ্দেশ্য ছিল না যে, তার উল্লেখিত ইকরাহ শব্দের মধ্যে দারুরাহও অন্তর্ভূক্ত হবে? নিরুপায়কারী ইকরাহ ও নিরুপায়কারী দারুরাহ বা অনন্যোপায় অবস্থা একই নয়? উভয়টার মাঝে পার্থক্য শুধু উৎপত্তিগত। নাম ও হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ইকরাহের উৎস: (ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে,) একজন আরেকজনকে দিয়ে করানো। অর্থাৎ যা অন্যের উপর কুফরী কালিমা উচ্চারণ করাকে দারুরী বা আবশ্যক করে তোলে।

আর দারুরাহ’র উৎস হল, যার মধ্যে কোন মানুষ কারণ হয় না। তথা কারো উপর তাকদীরীভাবে যে বিপদ আপতিত হয়। যা কখনো জীবন, সন্তান বা সম্পদ হারানোও হতে পারে। অথবা শরীয়তের আবশ্যকীয় বিষয়াবলী, তথা তার পঞ্চ উদ্দেশ্যের কোন একটিতে ব্যাঘাত ঘটাও হতে পারে।

অথবা ইকরাহ হল, যা দলের উপর সংঘটিত হয়। প্রয়োজন বা দারুরাহ এর স্তর হিসাবে এটা পরিবর্তিত হয়। সাধারণভাবে তীব্র প্রয়োজনকে দারুরা এর পর্যায়ে রাখা হয়। আর এটা এমন মারাত্মক কষ্টের সম্মুখীন হওয়ার দ্বারা বা নির্মূল ও ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়ার দ্বারা বাস্তবায়িত হয়, যা তার ক্ষেত্রে দারুরাহ এর হুকুমে। এর কারণে কুফরী আমল বৈধ হবে না। কারণ যৌক্তিকভাবে কোন জামাতের পক্ষ থেকে কুফরী আমল কিছুতেই সঠিক হতে পারে না। তবে যেটা হতে পারে, তা হল কুফরের কাছে নিরব আত্মসমর্পণ। যেমন কাফের শাসকদের ব্যাপারে চুপ থাকা বা নিজের কোন হক উদ্ধারের জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাদের স্মরণাপন্ন হওয়া। তবে সেই ভ্রান্ত শাসনব্যবস্থার প্রতি অন্তর জুড়ানো বা সন্তুষ্ট হওয়া যাবে না।

পক্ষান্তরে এমন কথা বলা যে, যখন জামাতের উপর দারুরাহ বা অনন্যোপায় অবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন তাদের জন্য সম্মিলিতভাবে খৃষ্টধর্মে প্রবেশ করা বা তার প্রতি আহ্বান করা বা তাকে গ্রহণ করে নেওয়া জায়েয... এটা পরিস্কার কুফর, স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি কুফর। আল্লাহর নিকট এর থেকে আশ্রয় চাই।

তিনি আরেকটি বিষয় বলেছেন যে- কারো অধিকার খর্ব হয়েছে। আর সে তা উদ্ধারের জন্য মানবরিচত আইনের আদালত ব্যতিত কোন উপায় পাচ্ছে না, তাহলে...। এটা তো আমরাও সমর্থন করি। আমাদের পূর্বের আলোচনায় আমাদের মতও এটাই ছিল। কিন্তু উক্ত লেখক যা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন তার সাথে তো এর কোন সম্পর্ক নেই। তবে সাদৃশ্য

ওপরের পর্যালোচনায় আমরা যে সারকথায় পৌঁছেছি, তা এখানে তুলে ধরছি:

১. إكراه (বলপ্রয়োগ) ও ضرورة (অনন্যোপায়) অবস্থা কিছু কিছু বর্ণনার মধ্যে এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, অনন্যোপায় অবস্থাই বলপ্রয়োগ বা বাধ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করে, আবার

দেখে দেখে বিকৃত করলে ভিন্ন কথা। কারণ তিনি তো তর্কবিদ্যার ধারাবাহিকতা চালু করেন এবং গণিত শাস্ত্রীয় শূন্যস্থান পুরণের অভিযানে নামেন।

-যেমন এক ব্যক্তির কাপড় ছিনিয়ে নেওয়া হল। তাই সে তা ফিরে পাওয়ার জন্য শরয়ী আদালত না থাকায় মানব-রচিত আইনের আদালতের স্মরণাপন্ন হল-। এটাকে এই গবেষক গণ্য করেছেন দারুরার কারণে কুফরে লিপ্ত হওয়া। তার ছিনিয়ে নেওয়া কাপড় উদ্ধার করা একটি দারুরাহ (অনন্যোপায় অবস্থা)!! হারানো কাপড় উদ্ধার করার জন্য কুফরী করা জায়েয!!

এটা কোন মানতিক? এই লেখকের অন্ধ গলি হতে বেরুবার একটিই পথ- তা হল, এই সূরতের সাথে আমাদের আলোচিত সূরতের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে তাকফীরের কোন বিষয় নেই। কারণ এটা মানব-রচিত আইনের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া বা নতুন করে তা প্রণয়ন করা বা তার সাহায্য করার কোন রূপ নয়। এটা তো হল, ব্যক্তিগতভাবে একটি শরয়ী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কুফরী আদালতকে ব্যবহার করা। চাই তা একটি মাত্র দিরহাম উদ্ধার করার জন্য হোক বা একটি প্রাণ রক্ষার জন্য হোক।

এটা আর বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে না যে, লেখক এ সমস্ত বিক্ষিপ্ত কথাবার্তাগুলোর মাধ্যমে যুগের সকল তাগুতগোষ্ঠীকে এই দাবি করার সুযোগ করে দিয়েছেন যে, তারা এমন অনন্যোপায় অবস্থায় পতিত, যা তাদের জন্য কুফরকে বৈধ করে দিয়েছে। যেমনটা তিনি ব্যক্ত করলেন। ইলম নিয়ে খেলা করার জন্য এটাই যথেষ্ট!

আমি আলোচনা এর চেয়ে বেশি লম্বা করতে চাই না। লম্বা করার কোন কারণও নেই। যেহেতু আমরা দেখতে পেয়েছি যে, পুরো আলোচনাটির ভিত্তিই হল একটি কল্পিত বিভক্তি। যেন এর মাধ্যমে গবেষক একটি মতের উপর আরেকটি মতকে প্রাধান্য দিতে পারেন। অথচ এ ব্যাপারে মত একটিই। কুপ্রবৃত্তি যেটাকে খেলার পাত্র বানিয়েছে এবং বিভিন্ন ধরণের বক্তব্য যাকে বিকৃতির স্থান বানিয়ে নিয়েছে। যেন এর মাধ্যমে একটি শরীয়ত পরিপন্থী উদ্দেশ্যের দিকে পৌঁছতে পারে।

বলপ্রয়োগই অনন্যোপায় অবস্থার সৃষ্টি করে। আবার কখনো এ দুটি ভিন্ন অর্থেও এসেছে, যেখানে উভয়টির উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কারণ অনন্যোপায় অবস্থা হয়, যেখানে ব্যক্তির পক্ষে কিছুই আর করার থাকে না। আর বলপ্রয়োগ হয়, যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে ব্যক্তির প্রতি প্রত্যক্ষ হুমকি দেওয়া হয়।

২. বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে কুফর জায়েজ হবার বিষয়টি কেবল কথার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কাজের ক্ষেত্রে এটা ওযর বলে গ্রহণযোগ্য হবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত। বরং কুফরী থেকে নিম্ন পর্যায়ের কিছু কাজের ক্ষেত্রেও বলপ্রয়োগ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন কতিপয় ফুকাহাদের নিকট যিনার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ গ্রহণযোগ্য ওজর না।

৬. কোন কর্তৃত্বশীল শাসনব্যবস্থার প্রধান কি বলপ্রয়োগের শিকার হতে পারে?

আমরা যেমনটা দেখি যে, একজন শাসক একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনব্যবস্থার প্রধান। যাতে আছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বিভাগ। সে সমস্ত সশস্ত্র শক্তির সর্বোচ্চ প্রধান। তার একটি কথায় সমস্ত সেনাবাহিনী, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাবাহিনী, পুলিশি ও সামরিক গোয়েন্দাবাহিনী সকলে নড়েচড়ে উঠে। সর্বপ্রকার অস্ত্র ও সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়ে যায়। যেমন মিশর, তুরস্ক, এমনিভাবে যেকোন দেশের যেকোন ক্ষমতাসীন সংগঠন বা সুপ্রতিষ্ঠিত দল বা কোন রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক বা আইনপ্রণয়নকারী পরিষদ।

স্বাভাবিকভাবে একটি দেশে সে-ই আইন রচনাকারী ও তা বাস্তবায়নকারী। সে-ই দেশের শাসক ও কর্তৃত্বশীল। সে কোন বলপ্রয়োগের সম্মুখীন হতে পারে না। বিশেষত: এমন বলপ্রয়োগ, যা কুফরী কালিমা উচ্চারণ বৈধ হওয়াকে আবশ্যক করতে পারে।

কেউ যদি বলে, তাহলে দলীয় বলপ্রয়োগ সম্পর্কে কি বলবেন? সম্পূর্ণ একটি দল কি যুদ্ধের হুমকি, অর্থনৈতিক শাস্তি বা অন্য কোন শাস্তির হুমকির সম্মুখীন হতে পারে না? যা শাসককে কুফরী শাসনব্যবস্থার উপর বহাল থাকতে বাধ্য করে?

আমরা বলবো:

> **পূর্বে কি কখনো এমন যুগ অতিবাহিত হয়েছে বা সামনে, নিকট ভবিষ্যতে বা দূর ভবিষ্যতেও কি কখনো আমরা এমন অবস্থা দেখার অপেক্ষা করতে পারি যে, কোন দেশের জনগণ এ ধরনের চাপের**

সম্মুখীন হবে না? চাই তারা যে ধর্মেরই হোক। তাদের শত্রুরা কি তাদেরকে হুমকি দিবে না?

কিউবার ব্যাপারে কি বলবেন? উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারে কি বলবেন? চিলির ব্যাপারে কি বলবেন? তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় পারস্য ও রোমের ব্যাপারে কি বলবেন?

নাকি দলীয় বলপ্রয়োগের মতের প্রবক্তারা কি বলবে: এ সকল ঘটনা আমরা আমাদের ইতিহাস, জাতীয় ঐতিহ্য ইত্যাদির বর্ণনার ক্ষেত্রে বলে থাকি বটে, কিন্তু আমরা বাস করছি ভিন্ন এক পরিবেশে। আর সেটা হল কাপুরুষতা ও গোলামীর পরিবেশ?

এমন পরিবেশেরই সম্মুখীন কি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার সময়গুলোতে হননি? এমন পরিবেশেরই সম্মুখীনই কি তারপরে ওমর, ওসমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হননি? এমন যুদ্ধের আশঙ্কা, যা শেষ হওয়ার ছিল না।

তারপর, কিভাবে সাদ্দামের ইরাক বহু বছরের অর্থনৈতিক অবরোধের মুখে অবিচল থেকেছে? অথচ তারা কত ভয়ংকর পরিস্থির শিকার হয়েছিল। তারপর তারা যুদ্ধেও নেমে পড়ল। অথচ সেটা ইমানের ভিত্তির ওপর বিশ্বাসের যুদ্ধ ছিল না। কিভাবে অগ্নিপূজক মাজুসি ইরান দীর্ঘ কয়েক বছরের অবরোধে দৃঢ় থেকেছিল? আর তারপর কিভাবে ইরান তার দূষিত চিন্তা সুন্নিদের দেহে ক্যান্সারের ন্যায় বিস্তৃতি লাভ করালো? । কিভাবে উত্তর কোরিয়া আমেরিকান অবরোধের মুখে দৃঢ় থেকেছিল?

খন্দক যুদ্ধ চলাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অবস্থান নিয়েছিলেন – তখন বলপ্রয়োগের মাসআলা কোথায় ছিল? যদি এরূপ বলপ্রয়োগের ওযর গ্রহণযোগ্যই হত, তাহলে সেই কঠিন যুদ্ধসমূহে, যখন সমস্ত মুসলিমরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখনই এর সুবিধা গ্রহণ করা অধিক যুক্তিসঙ্গত ছিল।

সেই সত্তা কতই না পবিত্র, যিনি বলেছেন:

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

“যদি বের হওয়ার ইচ্ছাই তাদের থাকত, তবে তার জন্য কিছু না কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত। কিন্তু তাদের ওঠাই আল্লাহর নিকট পছন্দ ছিল না। তাই তাদেরকে আলস্যে পড়ে থাকতে দিলেন এবং বলে দেওয়া হল, যারা (পঙ্গুত্বের কারণে) বসে আছে, তাদের সাথে তোমারাও বসে থাক “

আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে বঞ্চিত রাখার কারণ এটাই ছিল যে, তাদের কতক ঐ সকল দাবিগুলো করেছিল, যা আমরা আমাদের যামানায় অনেককে বলাবলি করতে শুনি.. ক্রুসেডার ও নাস্তিকবাদী শক্তি আমাদের জীবন বিপন্ন করে দিচ্ছে। তাদেরকে প্রতিরোধ ও চ্যালেঞ্জ করার মতো শক্তি আমাদের নেই। বাধ্য হয়ে ওজরবশত আমাদেরকে এখন তাদের অনুগত হয়ে থাকতে হবে। এ সকল দাবিগুলোর ভিত্তি এমন অলিক কল্পনার উপর, যার কোন দলিল নেই। যেমন, যেমন বলা হয়, রাষ্ট্রীয়ভাবেও মানুষ কোনো কিছুতে বাধ্য হতে পারে। আমরা আমাদের আকিদা ঘোষণা করলে এবং মানুষের সামনে তা প্রকাশ করে দিলে আসমান থেকে বজ্রে এসে পতিত হবে। আরো কত কী!!

আর কিভাবে বলপ্রয়োগের ওযর গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যেখানে সমস্ত মুসলিম দেশের শাসকগুলো -যাদের মধ্যে এরদোগানও আছে- মনে করছে, আমাদের এই দাওয়াত সন্ত্রাসী দাওয়াত। এটা আরবে তাদের রজত্ব ও সিংহাসনের জন্য চ্যালেঞ্জ। এটা তুর্কিদের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের জন্য হুমকি।

যখন তারা এমনটা বলে, যখন তারা রাজত্ব, সিংহাসন, গণতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য জিহাদি দাওয়াহ্‌ বিরুদ্ধাচরণ করে, দমন করে - তখন তাদের কর্তৃত্বের ওপর কোথায় বলপ্রয়োগ? এখানে বলপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্যগুলো কোথায়?

কাফিরগোষ্ঠীর হামলা, ধ্বংসাত্মক অবরোধ, মারাত্মক দুর্ভিক্ষ, শাসকদের উপর তাক করা তরবারী, এগুলোর ভয়ে কুফরী শাসনব্যবস্থার উপর বহাল থাকার কল্যাণ কী? এটা কি বলপ্রয়োগ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ভিত্তি?

আর এ ধরণের বলপ্রয়োগ কিভাবে দূর হবে? কবে? যখন প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই বিশ্বাসের উপর বেড়ে উঠছে যে - আমাদের এই দাওয়াত সন্ত্রাসী দাওয়াত। আর সমঝোতা ও সন্ধিই একমাত্র উত্তরণের পথ। গণতন্ত্রই একমাত্র সমাধান। কোন শাসকের জন্য শরীয়ত কার্যকর করা কখনোই অত্যাবশ্যক নয়।

এখানে জনগণ বা শাসকদের উপর কোন বলপ্রয়োগ নেই। বরং তাদের কার্যাবলীর উপর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। অর্থাৎ জিহাদী দাওয়াতকে খতম করা এবং জাহিলী শাসনব্যবস্থার সাথে চলার উপর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকার কারণেই তারা এসব কাজ করছে, বলপ্রয়োগের কারণে বাধ্য হয়ে না।

৭. এরদোগানের হুকুম কী?

অনেকে বলে: কিন্তু এরদোগান আরবের অন্যান্য শাসকদের মত নন। এই নিন তার প্রমাণ:

১. তিনি আল্লাহ ও তার রাসূলের ব্যাপারে সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করেন, ইসলামের চার রুকন বাস্তবায়ন করেন। এমনকি তার স্ত্রী পর্দানশীন।

২. তিনি একজন সাহসী সিংহ। ইহুদীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তিনি একজন বীরের মত 'ব্রিজ' এর সামনে পায়ের ওপর পা তুলে বসেছেন। শুধু তাই না, প্রতিবাদস্বরূপ হলরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন।

৩. তিনি তার দেশকে একটি সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। বড় বড় ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রগুলোর কাতারে নিয়ে গেছেন। তিনি তার জাতিকে দারিদ্র্যপীড়িত জাতির স্তর থেকে উন্নতির দিকে নিয়ে গেছেন।

৪. তিনি হিজাব ব্যবহারের স্বাধীনতা কার্যকর করেছেন। কুরআন তেলাওয়াত করেন, ফিলিস্তীনের দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের জন্য কেঁদেছেন, যেমন আসমা বেলতাজী রহিমাহাল্লাহর জন্য কেঁদেছেন।

৫. সিরিয়ান ও অন্যান্য উদ্বাস্তুদের জন্য তার দেশের সীমানা খুলে দেওয়া।

৬. আর পূর্বে আমরা যেগুলো উল্লেখ করেছি, সেগুলো তিনি পশ্চিমাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য করে থাকেন। কিন্তু আন্তরিকভাবে তিনি তা অপছন্দ করেন। এসবের প্রতি প্রতি সম্মত নন।

আমরা বলবো:

<u>এগুলো কি কোন শরয়ী দলিল, যা কোন শরয়ী মুফতি ও দ্বীনের আলেম গ্রহণ করতে পারে?</u>

প্রথমত: তার কালিমায়ে শাহাদাহ উচ্চারণ করা।

পূর্বেই দেখিয়েছি যে, কালিমা শাহাদাত তখনই ধর্তব্য হবে, যখন তার মাঝে ঈমান ভঙ্গকারী কোন জিনিস না থাকবে। কারণ, শাহাদাহ তাওহীদের শিরোনাম। পূর্ণাঙ্গ ও হাকিকী তাওহীদ নয়।

দ্বিতীয়ত: তিনি সাহসী সিংহ, ব্রিজের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেছেন, তার সামনে দাপটের সাথে বসেছেন।

এটা তার শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রমাণ হতে পারে। তার ইসলাম বা কুফরের প্রমাণ হতে পারে না। অনেক বিশ্বনেতারাই ওবামা ও যায়নবাদী শাসকদের সামনে বুক উচু করে দাপটের সাথে বসে। তবে আরবের হীন কুকুরগুলো এর ব্যতিক্রম।

তৃতীয়ত: তার দেশকে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো।

এটা তার জাতির জন্য তার একনিষ্ঠতা ও স্বচ্ছতার প্রমাণ। আবারও বলছি, ইসলাম বা কুফরের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

চতুর্থত: হিজাব পরিধানের বৈধতা চালু করা এবং রাবেয়া চত্তরের শহীদদের দূরাবস্থার জন্য দু:খিত হওয়া।

এটা সহমর্মিতা ও এটা তার ভালো মনের অধিকারী হওয়ার প্রমাণ। ইসলামের প্রকাশ্য আমলগুলোর মধ্যে একটি তিনি করেছেন।

সমস্যাটা এখানেই। এ যুগের সকল মুরজিআ ইখওয়ান ও অন্যান্যরাও, হতাশা ও পরাজিত মনোভাবের শিকার, এ হতাশা ও পরাজিত মানসিকতা তাদেরকে এরদোগানের আচল ধরতে উদ্বুদ্ধ করেছে। যেভাবে পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয়ে খড়কুটোকে আকড়ে ধরা হয়।

আমরা পূর্বেও বলেছি যে, কোন ব্যক্তির মাঝে ইসলাম অনেক মৌলিক বিষয় পাওয়া যেতে পারে। যেমনটা তুর্কি জনগণের সাধারণ অবস্থা। **তাদের অধিকাংশই মুসলিম জনগণ। এতে কোন সন্দেহ নেই।** কিন্তু তারপরও যে কারো থেকে প্রকাশ্য ধর্মীয় বিষয়াদি প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে এমন কিছু প্রকাশ পেতে পারে, যা সুনিশ্চিতভাবে ঈমান নষ্ট করে দেয়। যেমন কারো মধ্যে নামায ও ইসলামের সবগুলো স্তম্ভ আছে। পর্দা সে পালন করে। কুরআন তিলাওয়াত করে। এগুলো সবই ইসলামের সুস্পষ্ট নিদর্শন। আবার তার থেকেই একই সাথে এমন কিছুও প্রকাশ পেতে পারে, যা সুনিশ্চিতভাবে ঈমান নষ্ট করে দিবে। এটা সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হতে পারে। দেশের প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী কারো ক্ষেত্রে হতে পারে। দলীয় প্রধানের ক্ষেত্রে হতে পারে। আবার রাষ্ট্র প্রধানের বেলায়ও হতে পারে। এরদোগানের ব্যাপারটা ঠিক এমনই। এখানে কয়েকটা উদারহণ তুলে ধরছি:

১. তার দলের মূলনীতি হল ধর্মনিরপেক্ষতা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় যা তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন। যেমন এরদোগান ড. মুরসির শাসনকালে মিশর সফরে মিশরের পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছে। মিশরবাসীকে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করার উপদেশ দিয়েছে। কারণ এটার মাধ্যমেই নাকি সুশাসন বাস্তবায়ন করা যায়, এটাই স্বার্থক শাসনব্যবস্থা! এমনটা তিনি একাধিক অনুষ্ঠানে বলেছেন।

২. তিনি এমন দেশের শাসক, ধর্মনিরপেক্ষতা যে দেশের শাসনকার্যের মূল উৎস। যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

যার মৌলিক ভিত্তির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র কতগুলো ব্যক্তিগত পালনীয় বিধি-বিধান ব্যতিত। রাষ্ট্রীয় ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

৩. ন্যাটের সদস্য হওয়া। আর ন্যাটো এমন একটা জোট, আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, কেউ-ই তাতে ইসলামের কোন সমর্থক খুঁজে পাবে না। সামরিক বিমানঘাঁটিগুলোকে তিনি আমেরিকান বিমানের জন্য অবাধে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। এগুলো এখান থেকে সুন্নীদের উপর সন্ত্রাসের নামে আঘাত হানছে। আমরা দায়েশের কথা বলছি না যে, আমাদেরকে একপেশে গবেষণার অভিযোগ করা হবে।

৪. ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা। যেন তার জনগণের জন্য অর্থনৈতিক উৎস সৃষ্টি করতে পারে। শরীয়ত বিরোধী আইন প্রণয়ন করা। যেমন বিচ্ছিন্নতাবাদকে বৈধ করা। “চোখের পরিবর্তে চোখ” এই শাস্তিকে নিষিদ্ধ করা। এছাড়া সমস্ত ইসলামী শরীয়তকে নিষিদ্ধ করা তো আছেই।

৫. রাবেয়া চত্তরের শহীদদের জন্য কাঁদেন। আবার বৃটেনের সাথে সমঝোতা করেন। সিরিয়ান মুসলিমদের হত্যাকারী পুতিনের সাথে আলোচনায় বসলেন। আলোচনা শেষে যৌথ বিবৃতি দিলেন, সন্ত্রাস (জিহাদ) মোকাবেলায় তারা একমত।

৬. বিভিন্ন সংলাপ ও পরিকল্পনায় ইস্রাইলের সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করা। যেটা তার অবস্থান স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে “পায়ের ওপর পা তুলে, বীরপুরুষের মতো বসার” চেয়ে থেকে অধিক শক্তিশালী।

৭. মুহাজিরদের জন্য দেশের বর্ডার খুলে দেয়া নিয়ে কথা হল, এক দিক থেকে এটা মহানুভতা ও সাহসী ভূমিকা। আরেকদিক থেকে এটা পশ্চিমা দেশগুলোতে উদ্বাস্তুদের ঢল থামানোর জন্য ইউরোপীয়ানদের সাথে সমঝোতা চুক্তি। আর প্রথমটির চেয়ে

দ্বিতীয়টিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমরা আবারো বলছি, এ কাজের সাথে ইসলাম বা কুফরের কোন সম্পর্ক নেই।

৮. ইসরাঈলের ভেতর যখন আল্লাহর অনুগ্রহে যে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, তার মোকাবেলার জন্য ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে অগ্নিনির্বাপক বিমান প্রেরণ করেছেন। অপরদিকে আলেপ্পোবাসীকে সাহায্যবিহীন ফেলে রেখেছেন!

আমাদের এটা ভুলে গেলে হবে না যে, একজন মানুষের মনে কী আছে, তা বুঝার কোনো উপায় নেই। মানুষের অন্তরের কী আছে এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমাদের দেখার বিষয় হল প্রকাশ্য অবস্থা। অন্তরের বিষয়ের দায়িত্ব আল্লাহর হাতে"। তাহলে তার অন্তরে কি আছে সেটা কিভাবে বলা যাবে বা কিভাবে জানা যাবে? তাই এরদোগানের মনে কী আছে, তা নিশ্চিত করে বলার বা জানার কোনো উপায় নেই। এ নিয়ে চূড়ান্ত কিছু বলা বিভ্রম ও ভ্রষ্টতা বৈকি। যার গুনাহ ঐ সকল লোকদের গুনাহের ন্যায়, যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

উপসংহারঃ

এরদোগান শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন মানুষ। তিনি তার দেশ ও জাতিকে ভালোবাসেন। নিজ দেশের উন্নতির জন্য কাজ করেন। নিজের ও নিজের জাতির সম্মান বুঝেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কিছু বিধি-বিধানকেও ভালবাসেন, যেগুলোকে এক সময় তার দেশ আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছিল। খেলাফতের যামানায় যেগুলোর দ্বারা তার দেশের জনগণকে পরিচালিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বরং আরো একটু আগে বেড়ে বলা যায়, তার অন্তরে মুসলমানদের ভালোবাসা রয়েছে, যা তার কিছু কিছু কাজের দ্বারা প্রকাশ পায়। বরং তার পায়ের জুতা সকল আরব শাসকের মাথার ওপর হতে পারে। কিন্তু আমরা তাকে মুসলিম বলতে পারি না

তিনি মুসলিম নন। তিনিঐ সকল শাসকদের মতই, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতিত ভিন্ন বিধান দিয়ে শাসন করে, পরিস্কার ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়ে শাসন করে এবং তার প্রতি আহ্বান করে। এটা ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয় যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। তিনি যতই নামায পড়েন না কেন, রোজা রাখেন না কেন বা তার প্রেমিকরা তাকে মুসলিম বলে ধারণা করুক না কেন।

আর এখানে তার ওপর বলপ্রয়োগ বা তার অনন্যোপায় হবার মতো কিছু নেই। এখানে ইকরাহ বা জরুরুত খুঁজে পাবেন না, তবে প্রবৃত্তির অনুসারী বা সিরিয়ান ট্রাজেডির প্রেক্ষাপটে তার কাছ থেকে অস্ত্র ও সাহায্য লাভের নগদ স্বার্থকে প্রাধান্য দিল, খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন আলিম ও মুফতির নিকট এগুলো গ্রহণযোগ্য না যে শুধুমাত্র শরয়ী দলিলের দিকে তাকায়। দলিল ছাড়া কোন মুসলিমকেও কাফির বলা যাবে না এবং কোন

কাফিরকেও মুসলিম বলা যাবে না। এখনো পর্যন্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত ইসলাম থেকে সে অনেক দূরেই আছে[৬]।

আল্লাহ জানেন যে, তুর্কিরা একটি শাসনব্যবস্থা হিসাবে ইসলামী অনুশাসনের দিকে ফিরে আসুক, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করুক এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আল্লাহর শরীয়ত নিশ্চিহ্ন করার মোকাবেলায় দাড়িয়ে যাক – এটা আমাদের আকাঙ্ক্ষা না। বরং এটা প্রথম দিন থেকেই আবশ্যক ছিল এবং আজও আবশ্যক, যতক্ষণ না আমরা তা দেখতে পাই। কারণ আল্লাহর হুকুম নিয়ে খেলা করা জায়েয নেই এবং কোন কারণেই আল্লাহর হুকুম পরিবর্তন করাও জায়েয নয়।

আর নির্দিষ্ট কোন স্বার্থের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শাসনের সাথে সহযোগীতামূলক অংশগ্রহণ করার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের এ ধরণের কোন কাজ জায়েয করার জন্য শরীয়তের কোন হুকুমকে পবির্তন করার অনুমোদন নেই। এই আলোচনার জন্য ভিন্ন স্থান রয়েছে। সেখানে তা করা যাবে।

আমরা আশা করছি, এর কোন লিখিত ও যথাযোগ্য ইলমী জবাব দেখতে পাবো। যাতে যারা ভিন্ন কোন ফলাফলে পৌঁছেছেন, আমরা তাদের দলিলগুলোর সাথে আমাদের দলিলগুলোকে মিলিয়ে দেখতে পারি।

ড. তারিক আব্দুল হালিম
৪ সফর, ১৪৩৮ হি. মোতাবেক ৫ নভেম্বর ২০১৬ ইং
অনুবাদ: ৯ রজব, ১৪৩৯ হি. মোতাবেক ২৬ মার্চ ২০১৮ ইং

---

[৬] আলোচনা শেষের সারাংশটি হল এই যে, ফাতাওয়াটি এমন না যে, এটা তুরস্কের সাথে আচার-ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং অবস্থান ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এ সম্পর্কে বেশ কিছু সুরত ও গঠন রয়েছে। যেমন তা তুর্কি জাতির সাথে সম্পর্কিত নয়, যেহেতু তাদের মুল হল ইসলাম। এবং দেশের ভিতরে কোন ধরণের বিস্ফোরণ হামলা চালানো, যাতে সাধারণ মুসলমান নিহত হয়, জায়েজ নয়।